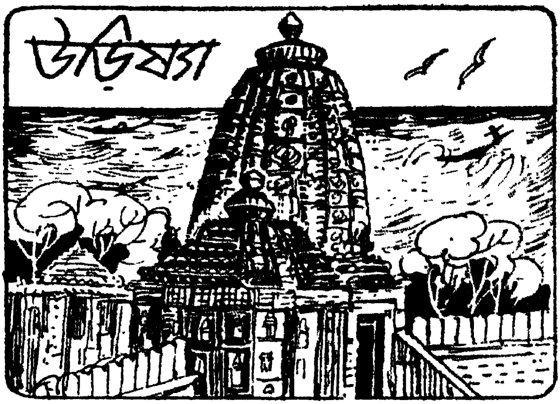
আমাদের দেশ



রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত রম্যাণি বীক্ষ্য প্রণেতা

শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট . কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭১

চিত্রশিল্পী : শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসমর দে

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
পবাণী প্রেস
৩১ বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা


উপহার

বাবুল খোকনকে

এই লেখকের লেখা আরও দু'খানি গ্রন্থ —

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা : ৫·০০ ঋষির কথা : ৬·৫০

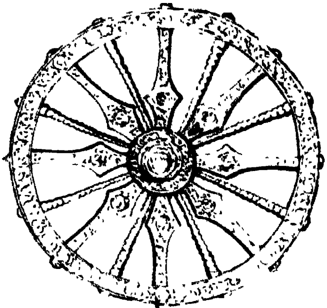
প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কাহিনী।

*

এই লেখকের লেখা ভ্রমরণসসিক্ত উপন্যাস

রম্যানি বীক্ষ্য :

১. দ্রাবিড় পর্ব ২. কালিন্দী পর্ব ৩. রাজস্থান পর্ব
৪. সৌরাষ্ট্র পর্ব ৫. মহারাষ্ট্র পর্ব ৬. উৎকল পর্ব
৭. উত্তরভারত পর্ব ৮. হিমাচল পর্ব



আমাদের দেশ

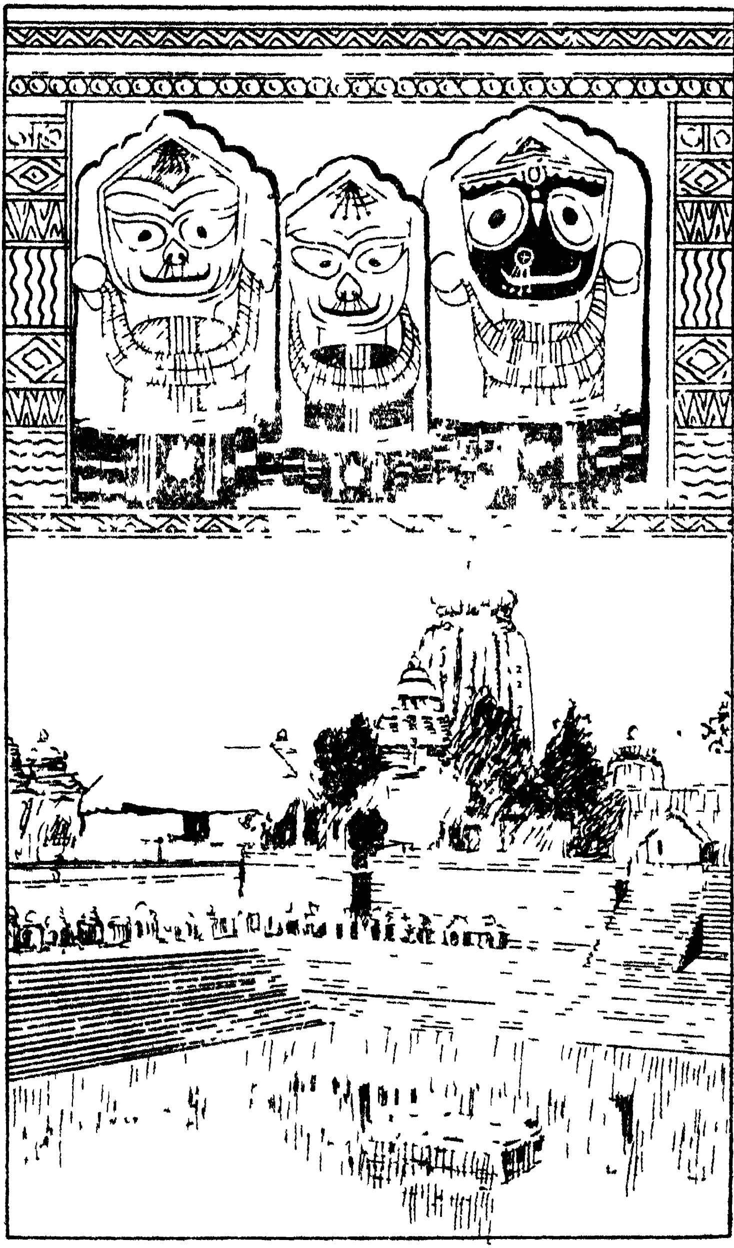
উড়িষ্যা

ভূমিকা

বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে যে কয়জন সাহিত্যিক আলোড়ন আনিয়াছেন রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'রম্যাণি বীক্ষ্য'এর বিভিন্ন পর্ব প্রায় প্রতি ঘরেই দেখা যায়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের জন্য এইরূপ ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। এই অভাব পূর্ণ করার জন্য সুবোধবাবু এবার **আমাদের দেশ** নামে পূর্বানুক্রমিক ভ্রমণ-কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে আমরা উড়িষ্যার ভ্রমণ-কাহিনীটি প্রকাশ করিলাম। ইহার পর ইহার বিভিন্ন পর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

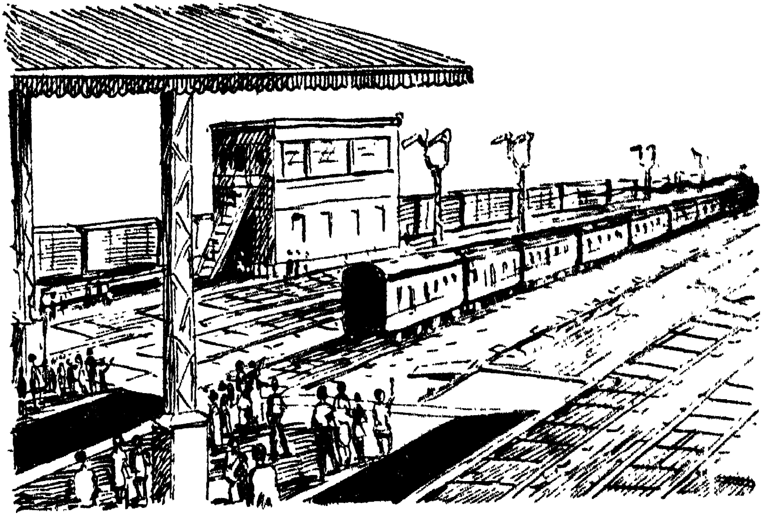
১৪ আশ্বিন, ১৩৭১

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক



উপরে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার শ্রীমূর্তি

নীচে—বিন্দু সরোবর



কে একজন বলেছিলেন যে যদি কয়েক দিনের জন্য সুখী হতে চাও তো দেশ ভ্রমণে বার হও। কথাটা কে বলেছিলেন আমার মনে নেই, কিন্তু এখন সত্য বলে বিশ্বাস করি। শৈশবে বাবা মার সঙ্গে যখন দেশ দেখতে বেরতাম, তখনও ভাল লাগত। এখনও ছুটি পেলে ঘরের বাহিরে বেরবার জন্য মন উতলা হয়। এমন কি ঘণ্টু ও পুপুর মতো সঙ্গী নিয়েও বেরতে আপত্তি নেই। ওরা জ্বালাতন করব না বলেও জ্বালাতন করেছে; বাড়ি ফিরেও বলেছে, পরীক্ষার জন্যে 'এসে' লিখে দাও, 'ছুটিটা কেমন কাটালে' এই বিষয়ে রচনা।

ছুটিটা যে আমার আনন্দে কেটেছে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু দেশ নয়, ওরাও আমাকে আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু সে কথা আমি ওদের কাছে স্বীকার করি নি। তা করলে ওরা বারে বারেই আমার সঙ্গে বেরতে চাইবে।

সেবারে পুজোর আগে স্কুল যখন ছুটি হল, তখন ভাবলাম যে কয়েক দিনের জন্য বেড়িয়ে আসি। বড়দার কাছে অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টু ও পুপু তখন ঘরে ছিল। দুধার থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরল, 'তোমার সঙ্গে আমরাও যাব ছোটকা।'

ওদের আগ্রহ দেখে বলেছিলাম, 'বেশ তো!'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বড়দা বলেছিলেন, 'তুমি একা যাও, ওদের সঙ্গে নিলে অনেক ঝামেলা হবে।'

ঘণ্টু আর পুপু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কিছু ঝামেলা হবে না বাবা, ছোটকা যা বলবেন তাই করব।'

আড়াল থেকে বড় বৌদি বলেছিলেন, 'যাক না সঙ্গে, কোথাও তো বেরয় না ওরা।'

আর বাধা কিসের! মায়ের অনুমতি যখন পাওয়া গেছে, তখন আর বাবা কোন আপত্তি করবেন না। ঘণ্টু ছুটে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি আমাদের খুব লক্ষ্মী মা।'

আমি হেসে বললাম, 'নিজের জিনিস কিন্তু নিজে বইতে হবে। স্বাবলম্বী না হলে আমি তোমাদের ভার বইতে পারব না।'

পুপু বলল, 'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না ছোটকা, আমরা এক্ষুনি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'

বড়দা তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে ট্রাভেলার্স চেকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বেশি টাকা সঙ্গে রাখা ভাল নয়। দরকার মতো ব্যাঙ্কে ভাঙিয়ে নিও।'

আর ছেলেমেয়েদের এক গোছা পোস্টকার্ড দিয়ে বলেছিলেন, 'একদিন পর পর চিঠি দিও।'

হাওড়া স্টেশনে পুরী এক্সপ্রেসে তিনি আমাদের তুলে দিতে এসেছিলেন। চিন্তিত ভাবে বললেন, 'স্কুলের ছেলেরা তোমাকে মানে না বলে শুনেছি, তুমি কি পারবে ওদের সামলাতে!'

মাস্টার আমি নতুন হতে পারি, কিন্তু এ বদনাম আমার নেই।
প্রতিবাদ আমাকে করতে হল না, ঘণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'খুব পারবেন বাবা।'

আমি হাসলাম, হাসলেন বড়দাও বললেন, 'পারলেই ভাল।'

তারপর ঢং ঢং করে প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

আমি বললাম, 'বাবাকে প্রণাম করে এবার গাড়িতে ওঠ।'

চক্ষের নিমেষে দুই ভাইবোন ঝুপঝুপ করে প্রণাম করে গাড়িতে উঠে পড়ল। দুবার তাদের বলতে হল না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার আগে আমিও বড়দাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠলাম। বড়দা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'দুর্গা দুর্গা।'

তারপর ~~দ্বিতীয়~~ তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল, বাঁশি বাজল গার্ডের। সামনে সবুজ বাতি, পিছনেও সবুজ। ভোঁ করে সিটি দিয়ে পুরী এক্সপ্রেস ছাড়ল। রাত পৌনে নটা।

নিজেদের জায়গায় এসে বসতেই ঘণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'কখন্ আমরা পুরী পৌঁছব ছোটকা?'

বললাম, 'এই তো চলার শুরু, এখনই কেন পৌঁছবার ভাবনা!'

'ভাবছি আমরা ঘুমোব, না জেগে থাকব!'

বললাম, 'রেলগাড়ি হল খুকুমণির দোলনা। সারাক্ষণই দুলছে। জেগে থাকবার চেষ্টা করলেও জেগে থাকা যায় না।'

পুপু বলল, 'তবে তো ভারি বিপদ হবে।'

'কেন?'

'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের জাগিয়ে দেবে কে?'

হেসে বললাম, 'সে ভার আমার। পথ তো কম নয়: তিনশো মাইলেরও বেশি। সবাই আমরা ঘুমিয়ে উঠতে পারব।'

ঘণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও ছোটকা, কখন্ পৌঁছবে আমি অঙ্ক কষে বার করে ফেলছি। কত মাইল পথ বললে?'

'তিন শো দশ মাইল।'

'আর এই ট্রেনটা ঘণ্টায় কত মাইল যায়?'

'ধর তিরিশ মাইল।'

'ও বাবা, তাহলে তো দেখছি—'

পুপু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কী দেখছ?'

ঘণ্টু বলল, 'সারা রাত লেগে যাবে। দশ ঘণ্টারও বেশি।'

'কত বেশি?'

ঘণ্টু এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, বলল, 'শুয়ে পড় পুপু, আমরা এক ঘুম ঘুমিয়ে নিই।'

বলে ঘণ্টুই আগে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

পুপু তার প্রশ্নের কথা ভুলল না, বলল, 'কত বেশি তা বললে না?'

আমি জানি যে ঘণ্টু আর উত্তর দেবে না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পুপুও শুয়ে পড়ল।

আমাদের কথাবার্তা শুনে এক সহযাত্রী ভদ্রলোক হাসছিলেন। বললেন, 'আরও ভোরে পৌঁছলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের লাভ হত। যত তাড়াতাড়ি নামা যায়, ততই আরাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কটায় পৌঁছব আমরা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'টাইম টেবলে তো দেখেছি, পৌঁছয় সকাল পৌনে দশটায়।'

পুপু মিটমিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'টাইম টেবল কী ছোটকা?'

বললাম, 'কাল সকালে তোমাকে বোঝাব।'

ঘণ্টু বলল, 'ছোটকার টেবিলে রেলের যে বইখানা ছিল, সেইটেই তো টাইম টেবল।'

অভিভাবকের মতো পুপু ধমক দিয়ে উঠল, 'ভাল হচ্ছে না দাদা, ঘুমোবার সময় তুমি কথা বলছ। মা কী বলে দিয়েছেন মনে নেই ?'

ঘণ্টু আর কথা কইল না। আমরা হাসলাম মুখ লুকিয়ে।

ভদ্রলোক তাঁর টাইম টেবলখানা বার করে আমার হাতে দিলেন। আমাদের বাড়িতে ছিল ঈস্টার্ন রেলের টাইম টেবল। এ গাড়ি সাউথ-ঈস্টার্ন রেলের। ভেবেছিলাম, এ লাইনের একখানা বই হাওড়া স্টেশনে কিনে নেব। কিন্তু সে কথা মনে ছিল না। এবারে এই জিনিসটি হাতে পেয়ে প্রথমেই মানচিত্রটি খুললাম।

তিনটি প্রধান পথ উড়িষ্যাকে চিরে ফেলেছে। একটি পথ কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গেছে সমুদ্রের ধারে ধারে। তারই উপর কটক আর ভুবনেশ্বর। চিল্কা হ্রদও এই লাইনের পাশে। আর খুর্দা রোড নামে একটা জংসন স্টেশন থেকে আমরা পুরী যাব।

এর উত্তর দিয়ে গেছে কলকাতা-নাগপুর লাইন। তারই উপর রাউরকেলা, শাখা লাইনে যুক্ত সম্বলপুর। রায়পুর আর বিজয়-নগরমকে যে লাইন যুক্ত করেছে, সেও এই রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে। ভাল করে নজর দিয়ে আরও তুটো শাখা লাইন দেখতে পেলাম। একটি ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের পথ, আর একটি কটক থেকে তালচের।

আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক বললেন, 'গোটা উড়িষ্যা রাজ্য দেখতে আপনার বেশি সময় লাগবে না। একবার উত্তরে গিয়ে এই শতাব্দীর সভ্যতা দেখবেন—রাউরকেলায় ইস্পাত কারখানা আর হীরাকুদে মহানদীর বাঁধ। ঐ দিকেই সম্বলপুরে অ্যালুমিনিয়মের কারখানা আর ব্রজরাজনগরে কাগজের কল। দক্ষিণে এসে তীর্থ করবেন যাজপুরে ভুবনেশ্বরে আর পুরীতে।

মন্দির দেখুন কোনারকে আর পিকনিক করুন চিল্কায়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের দরকার থাকলে চলে যান গোপালপুর অন সী-তে। উড়িষ্যা এতেই ফুরিয়ে গেল।

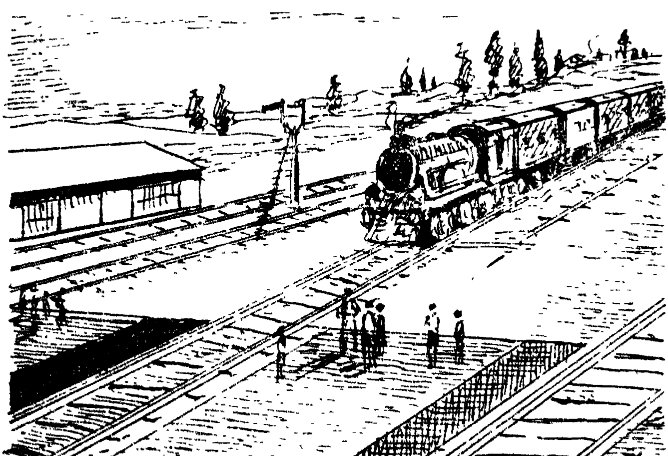
আমি বললাম, 'কেওনঝড়ের জঙ্গলে নাকি ভাল শিকার আছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'শিকারের শখ আমার নেই।'

সকাল বেলায় যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন চারিদিক একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যাত্রীরা কেউ ঘুমচ্ছেন, কেউ উঠে পড়ে চা খাচ্ছেন। আমিও এক ভাঁড় চা সংগ্রহ করে নিলাম।

এটি খুর্দা রোড জংসন। কখন আমরা কটক ও ভুবনেশ্বর পেরিয়ে এসেছি টের পাই নি। যাত্রীদের অনেকেই সেখানে নেমে গেছেন। পুরী পৌঁছতে আরও ঘণ্টা দুই সময় লাগবে বলে ঘণ্টু ও পুপুকে আমি জাগালাম না।

খানিকক্ষণ পরে তারা নিজেরাই জাগল। তারপর মুখ হাত ধুয়ে আমরা নামবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম।





সমুদ্রস্নানের দৃশ্য

পুরী স্টেশনটি খুব বড় নয়। সব ট্রেনের শেষ এইখানে। এখান থেকেই সব ট্রেন ফিরে যায়। প্ল্যাটফর্মে নেমে ইঞ্জিনের দিকে হাঁটতে হয়, ঠিক হাওড়া স্টেশনের মতো। ঐ দিকেই বেরবার রাস্তা। বাহিরে অসংখ্য সাইকেল রিক্স, যাত্রীর জন্য রিক্সওয়ালারা অস্থির হয়ে উঠেছে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও রিক্সয় উঠলাম। কোন হোটেলে আমাদের উঠতে হবে।

পুরীর রাস্তাগুলি ভাল। একটার পর একটা রিক্স ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বিদ্যুৎ বেগে ছুটেছে। অনেকটা পথ অতিক্রম করে আসবার পর ঘণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'সামনে আর কিছু নেই ছোটকা!'

পুপু বলে উঠল, 'রাস্তার শেষেই যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি।'

প্রথমটায় আমিও চমকে উঠেছিলাম। আমারও মনে হয়েছিল যে সামনেই পৃথিবীর শেষ। তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম।

ঘণ্টু মাথা উঁচু করে বলল, 'ও তো আকাশ নয়।

রিক্সওয়ালা পরম কৌতুকে পিছনে তাকিয়ে বলল, 'সমুদ্র।'

ঐ সমুদ্র! নীল নিথর নিঃসীম জলরাশি। তার কূল নেই, কিনারা নেই। শুধু গর্জন আছে। এতক্ষণ এই গুরুগম্ভীর ধ্বনি আমরা শুনতে পাই নি।

আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে রাস্তার শেষ সেখানে হয় নি, পথ বাঁ দিকে ঘুরে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আর দক্ষিণে দুরন্ত সাগর দিগন্তবিস্তৃত।

আমরা একটার পর একটা হোটেল দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। যেটা পছন্দ হয়, সেটায় জায়গা নেই। শেষ পর্যন্ত স্বর্গদ্বারের কাছে একটা ছোট হোটেলে আমরা উঠলাম। ঘরের জানালা দিয়ে আমরা সমুদ্র দেখতে পাব।

কিন্তু ঘণ্টু ও পুপু এক মুহূর্তও ঘরে রইল না, বারান্দায় বেরিয়েই আমাকে ডাকাডাকি শুরু করল, 'মজা দেখে যাও ছোটকা।'

পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'সমুদ্রের ধারে মানুষের মেলা বসেছে কেন?'

হোটেলে আসবার সময় তাদের দৃষ্টি ছিল পথের উপরে হোটেলগুলির দিকে। একটা আশ্রয় আমাদের চাই। এবারে সেই আশ্রয় পেয়ে আমাদের মন মুক্তি পেয়েছে। দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে দেখছি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে কিছু মেয়ে পুরুষ স্নান করছে। আর তীরে বালির উপর শুয়ে বসে অনেকে রোদ পোয়াচ্ছে আর গল্প করছে। অনেকে পায়চারি করছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার সেদিক থেকেও অনেকে এদিকে আসছে। শুধু আমার চোখের সামনে নয়, যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূরই দেখছি এই দৃশ্য। বললাম, 'মেলা তো নয়, ওরা সমুদ্র দেখতে বেরিয়েছে।'

ঘণ্টু আমার হাত ধরে টানল, 'চল না ছোটকা, আমরাও সমুদ্র দেখতে যাই।'

পুপু বলল, 'আমরাও সমুদ্রে নাইব।'

বললাম, 'আজই!'

দুজনেই এক সঙ্গে বলল, 'আজই।'

নিজের ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ল। আমি এ রকমের আবদার করলে বাবা বলতেন, 'না না, আজ নয়, নতুন জায়গার জল আজ সইবে না।' মা বলতেন, 'কাল আমরা নাইতে যাব।' তখন আমরা গুরুজনের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে শিখি নি। এখনকার ছেলেমেয়ে বৈজ্ঞানিক কারণ জানতে চাইবে। এরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখছে, অনেক বেশি জানতে চায়, শিখছেও অনেক বেশি। এরই সঙ্গে যদি নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠত, তাহলে দেশের দুর্দশা আর থাকত না। আমি তাদের বাধা দিলাম না। কাপড় গামছা নিয়ে আমরাও সমুদ্রের ধারে চলে এলাম।

সমুদ্র যেন একটা বিরাট প্রাণী। মাটির মতো নয়, পাহাড়ের মতোও নয়। পৃথিবীর প্রাণ আমরা দেখতে পাই নে। মাটি নদী পাহাড় এ সব যেন আলাদা আলাদা। সমতলের সঙ্গে পাহাড়ের কোন মিল নেই। এদের সব আলাদা আলাদা প্রাণ, ছোট ছোট সুখ দুঃখ। কিন্তু সমুদ্রের তা নয়। এই বিশাল সমুদ্র যেন একটা, এর শেষ নেই। যেন একটা বিরাট প্রাণী সারাক্ষণ হাসছে কাঁদছে, আনন্দ ও বেদনায় সারাক্ষণ ফুলে ফুলে উঠছে। রাগে গর্জন করছে, আবার শিশুর মতো খেলা করছে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। কড়ি এনে দেয়, ঝিনুক এনে দেয়, পা ধুইয়ে দেয় সাদা ফেনায়। তাকিয়ে না দেখলে মুখ ভার করে মানিনীর মতো আমরাও এই সমুদ্রে স্নান করতে এলাম।

যারা নুনিয়ার হাত ধরে স্নান করছে, তারা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুতেই এগোতে চাইছে না। নুনিয়ার সাহসে তাদের সাহস বাড়ছে না।

পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'মাথায় ওরা গাধার টুপি পরেছে কেন ছোটকা?'

নুনিয়ারা স্থানীয় লোক, অন্ধ্র দেশেও আছে নুনিয়া। কালো কষ্টি পাথরের মতো শক্ত সমর্থ চেহারা। সমুদ্রে মাছ ধরে, আর মাথায় সাদা টুপি পরে যাত্রীদের সমুদ্রে স্নান করায়। দেখতে সত্যিই গাধার টুপির মতো। বললাম, 'ওরা নুনিয়া, ওদের হাত ধরে আমরা নাইব। মাথায় টুপি না পরলে ভিড়ের ভেতর আমরা ওদের চিনতেই পারব না যে।'

ঘণ্টু জলে নামবার উদ্যোগ করছিল।

পুপু বলল, 'ওদের টুপি কেন জলে ভেসে যায় না?'

হেসে বললাম, 'সমুদ্রের সঙ্গে ওদের ভারি ভাব। ওদের শুধু দেয়, নেয় না কিছু।'

যারা একা স্নান করছে, তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দামাল ছেলের মতো দাপাদাপি করছে। বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে বেপরোয়া লড়াই। ঢেউ এলে ডুবতে হয়, কোন রকমে সামলে উঠে দাঁড়াতেই আর একটা ঢেউ। তাদের বেশ বাস বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু উৎসাহে উন্মত্ত তারা। আমি আশ্চর্য হয়ে তাদের দেখলাম। শুধু পুরুষ নয়, সঙ্গে মেয়েও আছে। মেয়েদের কলরবও শুনতে পাচ্ছি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নুনিয়া এসে ঘণ্টু পুপুর হাত ধরল। ওরা আমার মুখের দিকে তাকাল। নুনিয়ারা হাত ধরলে সমুদ্রকে আর ভয় নেই। ওদের হাত থেকে সমুদ্র কিছুই ছিনিয়ে নেবে না। আমি মাথা নাড়তেই দু ভাই বোনে এগিয়ে গেল।

যে ভদ্রলোক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছিলেন, তিনি বললেন, 'কী করছেন আপনি! ঐ জল্লাদদের হাতে ওদের ছেড়ে দিলেন!'

যে নুনিয়া তাঁর হাত ধরেছিল, সে বলল, 'আসুন না আপনিও।'

ভদ্রলোক চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'ক্ষেপেছ নাকি!'

নুনিয়া নিঃশব্দে হাসল তার এক সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে।

বেশ লাগছে এই নুনিয়াদের। তারা দলে দলে স্ত্রী পুরুষদের হাত ধরে স্নান করাচ্ছে।

সামনে থেকে ঘণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'পায়ের তলা থেকে বালি সরে যাচ্ছে ছোটকা।'

পুপু পিছিয়ে এসে বলল, 'আমাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

নুনিয়া আমার দিকে ফিরে হাসল।

আমি এগিয়ে গেলাম। তারপর সবাই মিলে স্নান করলাম আনন্দ করে। মাথার উপর ঢেউ ভেঙে পড়বার আগে ডুবতে না পারলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, তারপর টেনে নিয়ে যেতে চায়। সময় মতো ডুব দিলেই আর কোন ভাবনা নেই।

খানিকটা দূরে হঠাৎ হাসির রোল উঠল। চেয়ে দেখলাম, একটা ছেলে নাকানি চোবানি খেয়ে উঠল। তার হাতে একটা বক্স ক্যামেরা। সঙ্গীরা নাকানি চোবানি খাচ্ছিল দেখে তাদের ছবি তুলতে জলে নেমেছিল। এখন সবাই মিলে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'কেমন মজা! আর ছবি তুলবি আমাদের!'

ক্যামেরাম্যানের তখন নাকে মুখে সমুদ্রের জল, ক্যামেরার ভিতরেও জল ঢুকে গেছে।



সিদ্ধ বকুল

খেয়ে-দেয়ে উঠেই ঘণ্টু আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ছোটকা, আমরা জগন্নাথ দেখতে বেরব কখন?'

পুপু বলল, 'ঠুঁটো জগন্নাথ কী ছোটকা?'

বারান্দায় বসে আমি হোটেলের খবরের কাগজখানা পড়ছিলাম। দু ধার থেকে দু জনের দুই প্রশ্ন শুনে খবরের কাগজ নামিয়ে দু জনেরই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কারও মুখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই, নূতন উদ্যমে দৃষ্টি ঝলমল করছে।

আমার কাছে কোন জবাব না পেয়ে ঘণ্টু বলল, 'হোটেলের ওধারটাতেই অনেক রিক্স দাঁড়িয়ে আছে ছোটকা।'

বলে স্বর্গদ্বারের দিকটা হাত দিয়ে দেখাল।

পুপুরও কিছু বলা চাই। সে তার ঠুঁটো জগন্নাথের প্রশ্ন ছেড়ে বলল, 'একটা রিক্সতেই আমরা তিনজনে বসতে পারব।'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ভাগ্যে আজ আর বিশ্রাম নেই। এরা আমাকে এই দুপুর রোদেই টেনে বার করবে। তবু খানিকক্ষণ পরিত্রাণ পাবার আশায় বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে একখানা খাতা ছিল না?'

ঘণ্টু বলে উঠল, 'আমার কাছে আছে। মা বলেছেন সব টুকে রাখতে।'

বললাম, 'তাহলে এক কাজ কর।'

'কী কাজ?'

'একটা রিক্সওয়ালাকে ধরে জিজ্ঞেস কর যে তার রিক্সয় উঠলে সে আমাদের কী কী দেখাবে। তোমার খাতায় সব টুকে নিয়ে এস।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথমে আমাদের ঘরে ঢুকল, তারপর খাতা পেনসিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। নিশ্চিন্ত মনে আমি খবরের কাগজের পাতায় আবার মন দিলাম।

রিক্সওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরতে তাদের সময় লাগল না। পেনসিল দিয়ে খাতায় তারা অনেক কিছু টুকেছে। রিক্সওয়ালাকেও এনেছে সঙ্গে। যা পড়তে পারলাম না তা রিক্সওয়ালা আমাকে বলল।

দেখবার জায়গা এখানে অনেক আছে। এই স্বর্গদ্বারেই কত মঠ।

পুপু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে প্রশ্ন করল, 'মঠ কী ছোটকা?'

বললাম, 'সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া।'

'আখড়া মানে?'

'থাকবার জায়গা। তাঁরা সেখানে পুজো-অর্চনা সাধন-ভজন করেন।'

পুপু বলল, 'এখানে সবাই বুঝি সাধু-সন্ন্যাসী?'

আমি হেসে বললাম, 'বেরলেই বুঝতে পারা যাবে।'

ঘণ্টু বলল, 'তার পরে পড় ছোটকা।'

মন্দিরের পথেও দ্রষ্টব্য স্থান অনেক—সিদ্ধ বকুল গম্ভীরা শ্বেতগঙ্গা। এ দিকে লোকনাথ মহাদেব, ও দিকে মার্কণ্ড সরোবর। বড় রাস্তার উপরে জগন্নাথবল্লভ মঠ। নরেন্দ্র সরোবর ছাড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি, আঠারো নালা লক্ষ্মীজলা মাসির বাড়ি ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর চক্রতীর্থ ও সোনার গৌরাঙ্গ।

ঘণ্টুর কাণ্ড দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এমন যত্ন করে সব কিছু টুকে আনবে আমি আশাই করি নি। বললাম, 'এত সব জায়গা দেখতে তো সারা দিন সময় লাগবে।'

রিক্সওয়ালা বলল, 'দু দিন ধরে দেখলেই দেখাটা ভাল হয়, তবে সময় না থাকলে তাড়াতাড়ি দেখাও চলে।'

ঘণ্টু তাড়াতাড়ি বলল, 'যদি কিছু বাকি থাকে তো কাল সকালে আমরা দেখব '

ততক্ষণে আর একজন লোক এসে জুটেছিল। সে বলল, 'কাল আমাদের বাস ভুবনেশ্বর যাচ্ছে, সকাল সাতটায় বেরিয়ে বিকেল চারটেয় ফিরবে।'

পুপু বলল, 'আমরাও যাব ছোটকা।'

উৎসাহ পেয়ে সেই লোকটি বলল, 'আর পরশু কোনারক।'

ঘণ্টু বলল, 'আমরা কোনারকও দেখব।'

বিপদের কথা। এই দুই ভাই বোনে দেখছি আমাকে নাকাল করে ছাড়বে। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই বাসের সেই লোকটি আমাদের নাম লিখে নিয়েই সরে গেল। আমার মতামতের অপেক্ষা আর করল না।

রিক্সওয়ালা বুঝল যে যা দেখবার তা এই বেলাতেই দেখাতে হবে। তাই তাড়া দিয়ে বলল, 'আসুন বাবু।'

বললাম, 'তুমি জগন্নাথের মন্দিরের কথাই তো বল নি দেখছি, তোমার রিক্সয় কী করে চাপি !'

এক গাল হেসে রিক্সওয়ালা বলল, 'ও কথা তো জানা বাবু।'

ঘন্টু ও পুপু আমাকে টেনে তুলল। দুপুরের রোদ মাথায় করে আমরা পথে নামলাম।

রিক্সয় বসে প্রথমেই আমি বললাম, 'যা দেখবার তা এই বেলাতেই দেখিয়ে দাও। বাজে জায়গায় নিয়ে গিয়ে সময় নষ্ট ক'রো না।'

খুশী হয়ে রিক্সওয়ালা বলল, 'প্রথমেই তাহলে সিদ্ধ বকুলে যাই।'

আমি আপত্তি করলাম না দেখে ঘন্টু বলল, 'মঠগুলো আমরা দেখব না ?'

বললাম, 'মঠে কিছু দেখবার নেই।'

রিক্সওয়ালা বলল, 'শঙ্করাচার্য মঠেরই নাম বেশি।'

পুপু প্রশ্ন করল, 'শঙ্করাচার্য কে ছোটকা ?'

'অত বড় মহাপুরুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছেন।'

রিক্সয় দুই ভাই বোন আমার দু ধারে বসেছিল। তারা এক সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললাম, 'এক হাজার বছর আগে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কোচিন রাজ্যে শঙ্করের জন্ম হয়েছিল নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে। জন্ম জন্মান্তরে অর্জিত সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে এই জাতিস্মর পুরুষ জন্মেছিলেন। আট বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ষোল বছর বয়সেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বার হয়ে সারা ভারতের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের ধর্মমত মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।'

আমি ভেবেছিলাম যে আমার শ্রোতারা এবারে মায়া বাদ

সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইবে, কিন্তু তা চাইল না। চুপ করে শুনতে লাগল। বললাম, 'ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল। শঙ্করের চেষ্টাতেই আবার হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা হল। ভারতবর্ষে তিনি চারটি মঠ স্থাপন করলেন। উত্তরে হিমালয়ে যোশীমঠ, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে দ্বারকার সমুদ্রতীরে সারদা মঠ, আর পূর্বে পুরীতে এই গোবর্ধন মঠ। এই সব মঠে বেদ বেদান্তের চর্চা হয়।'

ঘণ্টু বলল, 'তারপর শঙ্করের কী হল?'

'সেই কথাটিই কারও জানা নেই। বত্রিশ বছব বয়সের পর তাঁকে যে আর দেখা যায় নি সেই কথাটিই সবাই জানে।'

ততক্ষণে আমরা সিদ্ধ বকুলে পৌঁছে গেছি। রিক্সা থেকে নেমে আমরা সেই প্রাচীন বকুল গাছটি দেখলাম। গাছের গোড়া ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, শুধু বাকল আছে। শুধু বাকল দিয়ে যুক্ত থেকে অত বড় একটা গাছ কী করে মাটি থেকে রস গ্রহণ করছে, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

যবন হরিদাস এই বকুল গাছের নিচে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। হরিদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু জাতিতে ছিলেন যবন। প্রখর সূর্যের নিচে বসে তিনি তপস্যা করতেন। এক দিন এক খণ্ড বকুলের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে মহাপ্রভু তাঁকে দেখতে এলেন। এসে তাঁর কষ্ট দেখে সেই ডালটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করল।

সিদ্ধ বকুলের গল্প শুনে ঘণ্টু বলল, 'ভারি আশ্চর্য তো।'

পুপু বলল, 'কিন্তু গুঁড়িটা গেল কোথায়?'

সে কথাও আমরা শুনলাম। জগন্নাথদেবের নব কলেবরের গল্প।

'নব কলেবর কী?'

'একটা মস্ত উৎসব। জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তি বিশ বছর পর পর বদল করা হয়। তারই জন্যে কাঠের দরকার। রাজা বললেন, ঐ বকুল গাছটি চাই। কিন্তু ঐ গাছের নিচে বসে যে যবন হরিদাস ভগবানের নাম করেন! তা হোক, রাজা বললেন, ঐ গাছেই জগন্নাথের নব কলেবর হবে। কারও কোন কথা তিনি মানলেন না, পর দিন লোক পাঠালেন গাছটা কাটবার জন্যে। রাজার লোকজন এসে চমকে উঠল, আশ্চর্য হয়ে দেখল যে গাছ আছে ঠিক আগেরই মতো, কিন্তু গুঁড়ি নেই। কাঠের বদলে ভেতরটা একেবারে ফাঁপা, শুধু বাকলের ওপর ডালপালা। রাতারাতি গাছের এই অবস্থা হয়েছে।'

পুপু বলল, 'সত্যি ছোটকা!'

দেবতার মাহাত্ম্য সত্য নয়, এ কথা বলা যায় না। তাই বললাম, 'নিশ্চয়ই সত্যি।'

তারপরে আমরা গম্ভীরায় গেলাম। গম্ভীরার আবহাওয়া সত্যিই বড় গম্ভীর, বড় শান্তিপূর্ণ। সেখানে আমরা মহাপ্রভুর পাদুকা কমণ্ডলু ও কাঁথা দেখতে পেলাম। আর দেখলাম রাধাকান্ত মন্দির। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে বেদান্তের তর্ক করেছিলেন, সে জায়গাটিও দেখলাম। মনে হল, এ সব জায়গা ঠিক এমন করে দেখবার জিনিস নয়, এখানে এসে খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে বসতে হয়। তবেই দেবতার প্রসাদ লাভ হবে।

এর পরে শ্বেত গঙ্গা।

শ্বেত গঙ্গা একটি শান বাঁধানো চতুষ্কোণ সরোবর। পথের উপর রিক্সা থেকে নেমে এই সরোবরের তীরে এসে দাঁড়ালাম। পরপারে খানিকটা দূরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল।

এক ব্রাহ্মণের কাছে আমরা শ্বেত গঙ্গার বিবরণ শুনলাম। ত্রেতা যুগে শ্বেতরাজ একশো বছর অনশন করেছিলেন, তার পর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের সঙ্গে শ্বেত মাধব রূপে বিরজ করছেন। আমরা শ্বেত গঙ্গা ও শ্বেত মাধব দর্শন করে রিক্সয় এসে বসলাম।

মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে আমরা মার্কণ্ডেয় সরোবরে গিয়ে পৌঁছলাম। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ, কিন্তু সরোবরটি বাঁধানো। মন্দির রাস্তার ধারেই।

এখানকার গল্পও আমরা শুনলাম। প্রলয়ের সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে পুরীর নিকটে এসেছিলেন এবং নীল পর্বতের উপর অক্ষয় বটগাছ দেখে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান নীল মাধব ছিলেন সেই গাছের নিচে। তাঁকে দেখে মার্কণ্ডেয় ঋষির বিস্ময়ের আর শেষ নেই। নীল মাধব বললেন, বৎস, তুমি তীর্থ নির্মাণ কর। এই আদেশ পেয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি সুদর্শন চক্র দিয়ে এই সরোবর সৃষ্টি করলেন।

তারপর আমরা মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখলাম। এই মন্দির মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্য-যুগে নির্মাণ করেছিলেন। এখন এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়।

মন্দির দেখে পুপুর যত আনন্দ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি খুশী হল বাহিরে রাস্তায় এসে। ওধার থেকে একটা হাতি দুলতে দুলতে আসছিল, তার মুখে একটা কলা গাছ। আমার একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'বুঝলে ছোটকা, এই জায়গাটা কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন বলতো ?'

পুপু বলল, 'কলকাতায় এমন হাতি আছে !'

ঘণ্টু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু হাতিটা যে আমাদের দিকেই আসছে !'

পুপু আমার হাতখানা আরও শক্ত করে চেপে ধরল। ঘন্টুও সরে এল আমার বুকের কাছে।

রিক্সওয়ালা বলল, 'ভয় নেই, ও পোষা হাতি।'

সামনে দিয়ে হাতিটা চলে যাবার পর ঘন্টু বলল, 'ভয় কে পাচ্ছে!'

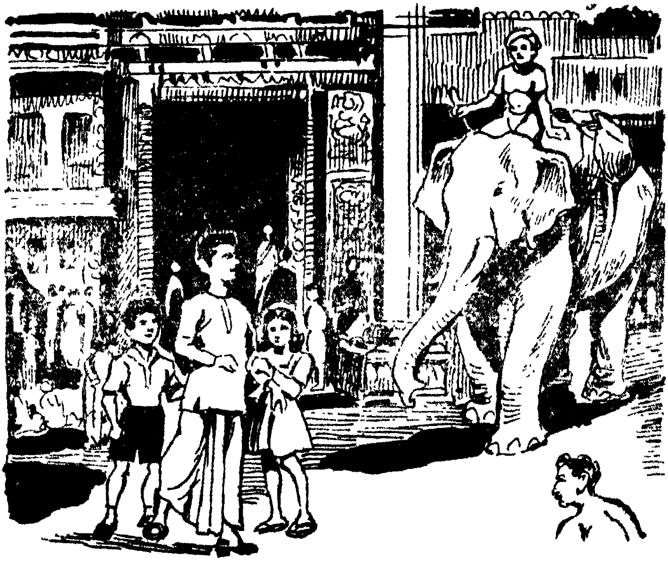
পুপুও আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হাতিকে আমরা ভয় পাই নে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় আমরা অনেক হাতি দেখেছি।'

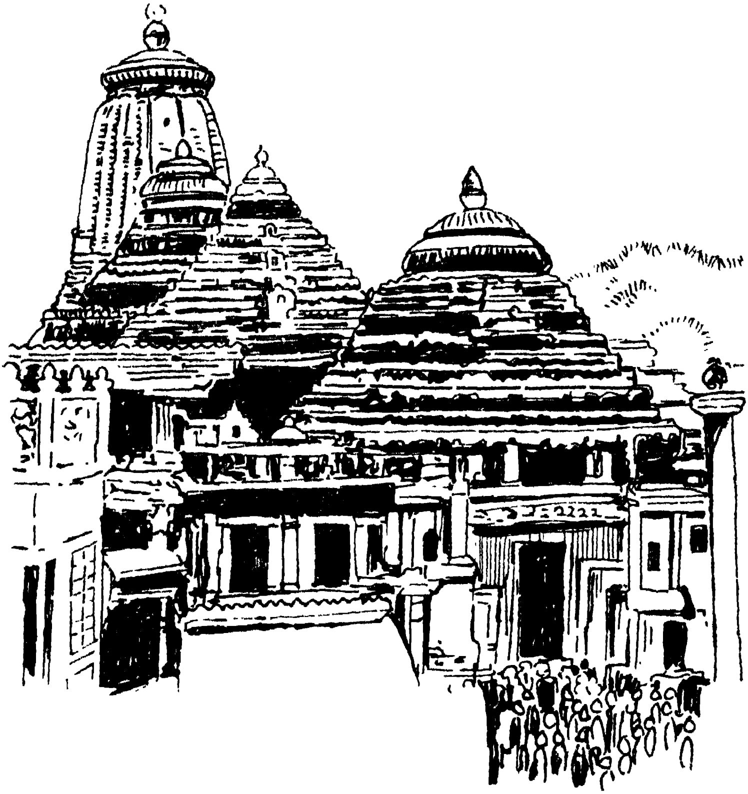
আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'তবে চলতো রিক্সওয়ালা, ওই হাতির পাশ দিয়ে আমরা যাই। শুঁড়টা কেমন করে নাড়ে দেখতে পাব।'

পুপু আবার আমার হাত চেপে ধরল, আর ঘন্টু সরে এল বুকের কাছে।

রিক্সওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি জড়িয়ে ধরলাম দুজনকে।





পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির

রিক্সায় চলতে চলতে পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'ঠুঁটো জগন্নাথ আমরা কখন্ দেখব ছোটকা ?'

ঘণ্টু বলল, 'জগন্নাথের মন্দির তো আমরা পেছনে ফেলে এলাম।'

আমি বললাম, 'ফেলে এলে কী হবে, আবার আমরা ফিরে যাব।'

বলে রিক্সওয়ালাকে মন্দিরে যাবার জন্য বললাম।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা মন্দিরের দরজায় এসে পৌঁছলাম

মন্দিরের প্রধান পথ এটি, নাম সিংহদ্বার। এই দিকেই সূর্য ওঠে, অস্ত যায় পিছনের দিকে। সে দিকে যে দরজা আছে, তার নাম খাজা দ্বার। উত্তরে ও দক্ষিণে আরও তুটি দরজা, তাদের নাম হস্তীদ্বার ও অশ্বদ্বার। জেলখানার মতো উঁচু প্রাচীর দিয়ে সমস্ত মন্দিরটি ঘেরা। এই প্রাচীরের নাম মেঘনাদ।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা প্রথমেই অরুণ স্তম্ভ দেখলাম। এটি নাকি কোনারকের মন্দির থেকে এসেছে। গরুড় স্তম্ভ ভোগমন্দিরের সামনে। যাত্রীরা প্রণাম করে এই স্তম্ভকে আলিঙ্গন করছে। এইটেই এখানকার রীতি।

এইবারে আমরা কোন্ দিকে যাব ভাবছিলাম। এক জন অপরিচিত লোক বলল, 'এই দিকে আসুন বাবু, এই দি॰॰

আর এক জন বলল, 'পূজো দেবেন তো ?'

তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'আটকিয়া বন্ধন ?'

আমি সবিস্ময়ে দেখলাম যে এক দল লোক আমাদের ঘিরে ধরেছে।

ঘণ্টু আমার হাত ধরে টানল, বলল, 'পালিয়ে এস ছোটকা।'

পুপু আমার আর একটি হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

কিন্তু পালাবার পথ নেই, সবাই মিলে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

কেউ বলল, 'আমি আগে ধরেছি।'

কেউ বলল, 'আমি আগে।'

শেষ পর্যন্ত কে আগে ধরেছে, এই নিয়ে বিবাদ। হাতাহাতি হবার উপক্রম।

ঘণ্টু আমাকে টানতে টানতে বলল, 'এই দিক দিয়ে ছোটকা।'

তাকে অনুসরণ করে আমি সেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম। শুধু বেরিয়ে আসা নয়, ব্যস্ত ভাবে পালিয়ে এলাম মন্দিরের অন্য ধারে।

ভাল করে নিঃশ্বাস নিয়ে পুপু প্রশ্ন করল, 'আটকিয়া বন্ধন কী ছোটকা?'

ঘন্টু বলল, 'পালিয়ে না এলে আমাদের বোধ হয় ওরা আটকে বাঁধত।'

আমি ঘন্টুর পিঠে একখানা হাত রেখে বললাম, 'তোমার বীরত্বেই এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।'

হঠাৎ পিছন থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, 'আপনাদের ওরা বাঁধত না, জগন্নাথের ভোগকে বলে আটকে বন্ধন। ভোগ দিতে হলে পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা জমা দিতে হয়।'

আমি পিছন ফিরে বললাম, 'তুমি কে?'

বালকটি ভয় পেয়ে বলল, 'আমি পাণ্ডা নই বাবু।'

ঘন্টুর সাহস বেড়েছে, বলল, 'যারা আমাদের ঘিরেছিল, তারা বুঝি পাণ্ডা?'

পুপু বলল, 'পাণ্ডারা কী করে ছোটকা?'

উত্তর বালকটি দিল, বলল, 'ওদের এক জনকে নিলেই অন্য সবাই চলে যেত। তার পর সে আপনাদের সব দেখিয়ে দিত। পূজা ভোগ এ সবের ব্যবস্থাও করে দিত।'

বীরের মতো ঘন্টু বলল, 'এ সবের আমাদের দরকার নেই। এস ছোটকা।'

বলে আমরা নিজেরাই মন্দির প্রাঙ্গণের ঠাকুর দেখতে লাগলাম। সব ঠাকুর তো চেনা যায় না, চিনলাম শুধু রাধাকৃষ্ণ সূর্য লক্ষ্মী সরস্বতী ও গণেশ।

যে বটগাছ দেখলাম, তার নাম নাকি অক্ষয় বট। এক ব্রাহ্মণ হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ভগবানের বপু এই অক্ষয় বট, এঁকে স্পর্শ করুন। ধন মান পত্নী ও পুত্রকন্যা যা চাইবেন, তাই পাবেন। এ হল কল্পতরু।'

আমি হেসে বললাম, 'পরীক্ষায় পাশ করা যায় না?'

বলতে বলতেই আমি ব্রাহ্মণকে এড়িয়ে গেলাম। ঘন্টু ও পুপু তাঁর দু হাতের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে এল।

বালকটি আমাদের পিছনে আসছিল। বলল, 'অনেকে এই কল্পতরুর নিচে আঁচল পেতে বসে থাকে। একটি পাকা ফল পড়লে খানিকটা খায় আর বাকিটা মাদুলি করে গলায় পরে।'

এই বালকটিই আমাদের একটি দরজা দিয়ে অন্য একটি প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। বলল, 'যেটি দেখলেন, সেটির নাম অন্তর্প্রাঙ্গণ, আর এটি বহিপ্রাঙ্গণ।

প্রথমেই আমাদের সে পশ্চিম দিকের নতুন রন্ধনশালার দিকে নিয়ে গেল। অসংখ্য উনুন। প্রতিটি উনুনের উপর সারি সারি হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত রান্না করা হয়। দেখবার জিনিস।

ঘন্টু ও পুপুর উৎসাহের অন্ত নেই। একে একে আমরা ভাঁড়ার গৃহ ময়দার কল অনেক দেবদেবী দেখলাম। সকলের শেষে শিব ঠাকুর দেখবার পর পুপু বলে উঠল। 'কই ছোটকা, ঠুঁটো জগন্নাথ তো আমরা দেখলাম না?'

সত্যিই তাই। মন্দিরের ভিতর ও বাহির দুটো প্রাঙ্গণই আমরা ঘুরে দেখলাম, কিন্তু মূল মন্দিরের ভিতর এখনও আমরা যাই নি। বালকটি বলল, 'জগন্নাথ দর্শন হলেই তো পুরীর সব দেখা হয়ে গেল। সকলের শেষে তাই জগন্নাথ দেখুন।'

এবারে আমরা মূল মন্দির দেখতে পেলাম। বাহির থেকে এর চারটি অংশ দেখা যায়। দেবতা থাকেন দেউলের ভিতর, তারই সঙ্গে জগমোহন ভোগমণ্ডপ ও নাট মন্দির।

পুরীর এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন উৎকলের রাজা অনঙ্গ ভীমদেব। সেই যুগে প্রায় তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিং জগন্নাথ দেবকে কোহিনূর দিয়েছিলেন।

পুপু প্রশ্ন করল, 'কোহিনূর কী?'

বললাম, 'সাড়ে তিন কোটি টাকা দামের একটি হীরে।'

ঘণ্টু বলল, 'কোহিনূর তো শুনেছি এ দেশে এখন নেই।'

বললাম, 'বিদেশীরা কেড়ে নিয়ে গেছে।'

পুপু বলল, 'এখন তা কোথায় আছে ছোটকা?'

এ কথার উত্তর দেওয়া আর হল না। মূল মন্দিরের ভিতর আমরা ঢুকে পড়েছিলাম। কালো পাথরের বেদীর উপর জগন্নাথ একা নন, সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা। সুদর্শন চক্রও আছে। রঙ-করা কাঠের মূর্তি বলে কলেবর পরিবর্তন করতে হয়। বিশ বছর পরপর তাই নব কলেবর উৎসব হয়।

পুপু প্রশ্ন করল, 'ঠুঁটো জগন্নাথের পাশে ওরা কারা ছোটকা?'

বললাম, 'দেবতাকে ঠুঁটো বলতে নেই। জগন্নাথ দেবের পাশে ওঁরা হলেন বলরাম আর সুভদ্রা।'

'ওঁরা কে?'

'বলরাম জগন্নাথ দেবের দাদা, আর—'

সেই বালক বলে উঠল, 'সুভদ্রা জগন্নাথের বউ।'

এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম, বললাম, 'বউ কেন হবেন! সুভদ্রা তো কৃষ্ণের বোন।'

সসঙ্কোচে বালক বলল, 'আমরা বউ বলি।'

জগন্নাথ গ্রাম্য দেবতা বলে আমি শুনেছি। তাঁকে টানাটানি করে পৌরাণিক সম্মান দেবার চেষ্টাতেই এই রকম হয়েছে। জগন্নাথের আকার আকৃতি দেখেই গ্রাম্য দেবতা বলে সন্দেহ হয়। পুরাণে নাকি আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীল মাধব দর্শনে। নীল মাধব চণ্ডালের দেবতা। বসু শবরের গৃহে বাস করে বিদ্যাপতি সেই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। বসুর পুত্র দ্বৈতা-পতি, তাঁরই বংশধর দ্বৈতা ও পতি। দ্বৈতারা জগন্নাথের অঙ্গরাগ করে, আর পতিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে পূজার অধিকার পেয়েছে। রন্ধনশালায় যে শোঁয়াররা কাজ করে, তারা বোধ হয়

প্রাচীন শবর জাত। একটা বইএ পড়েছিলাম যে বৌদ্ধরা নাকি এক সময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে মনে করতেন।

পুপু বলল, 'হাত সবার—'

বলেই থেমে গেল।

আমি জানি, 'ঠুঁটো' কথাটা তার মুখে আটকে গেল। আমি খুশী হয়ে বললাম, 'তার একটা ভারি সুন্দর গল্প আছে।'

ঘণ্টু বলল, 'বল না গল্পটা।'

'রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীল মাধব দর্শনের জন্য এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই পুণ্যফলে এক দিন সমুদ্রের জলে এক খণ্ড নিম কাঠ ভেসে এল। রাজা বললেন, এই দিয়েই ঠাকুরের মূর্তি গড়ব।

কিন্তু ঠাকুর এলেন কারিগরের ছদ্মবেশে। রাজাকে বললেন, আমি বন্ধ ঘরে মূর্তি গড়ব। একুশ দিন যেন কেউ না দেখে।

রাজা বললেন, তথাস্তু।

দিন যায়, মূর্তি গড়া আর শেষ হয় না। ব্যস্ত হয়ে রাজা ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন তিনটি অসমাপ্ত মূর্তি। চোখ মুখ সব হয়েছে, হয় নি হাত দুটো। আর কারিগরও নেই। রাজা নিজের দোষ বুঝতে পেরে আবার প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রহ্মা এলেন, আর তিনটি অসমাপ্ত মূর্তিকে রথে চড়িয়ে মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন থেকেই বছরে বছরে জগন্নাথের রথযাত্রা হচ্ছে।'

ঘণ্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা মাহেশে যেমন রথ দেখেছি তেমনি?'

বালকটি বলল, 'এখানে এক সঙ্গে তিনখানা রথ বেরোয়। তাদের নাম নন্দীঘোষ তালধ্বজ ও দর্পদলন। নন্দীঘোষ জগন্নাথের রথ, তার রঙ লাল ও হলদে। বলরামের রথ তালধ্বজ, তার রঙ লাল আর নীল। সুভদ্রা ওঠেন দর্পদলনে, তার রঙ লাল ও কালো। এক একখানা রথ যে কত বড়, তা না দেখলে আপনাদের

ধারণা হবে না। এপাশে ওপাশে তেইশ হাত, আর উঁচু আট জন বড় মানুষের সমান। রথের চূড়ো দেখতে হলে তিন তলা বাড়িতে উঠতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক দড়ি টানে, রথ তবু নড়ে না।'

বালকের গল্প এখানেই শেষ হল না। বলল, 'স্নান পূর্ণিমায় জগন্নাথরা তিন জনই সর্বাঙ্গস্নান করেন। তখন তাঁদের গায়ের রঙ সব ধুয়ে মুছে যায়। নতুন করে রঙ করতে ঠিক বারো দিন সময় লাগে। এই সময়কে বলে অনাবাসর। শ্রীগুণ্ডিচা দিবসে তাঁরা রথে চড়েন। তার আগে পুরীর রাজা এসে রথের সামনের রাস্তা সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে যান।'

ঘণ্টু বলল, 'কেন ?'

মুরুব্বির মতো গম্ভীর গলায় বালক উত্তর দিল. 'দেবতার কাছে মানুষে মানুষে তো কোন প্রভেদ নেই, রাজায় আর ঝাড়ুদারে।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই বুঝি !'

লজ্জিত ভাবে বালক বলল, 'তার পর উল্টোরথ। আট দিন পরে দেবতারা মন্দিরে ফিরে আসেন। সেই একই রকম ধূমধামে।'

একটু থেমে বলল, 'রথযাত্রার মতো আরও অনেক যাত্রা আছে। চন্দন যাত্রা স্নান যাত্রা ঝুলন যাত্রা রাস যাত্রা দোল যাত্রা। সব চেয়ে বড় হল নব কলেবর যাত্রা। কিন্তু তা প্রতি বছর হয় না, হয় বিশ বছর পর পর।'

কথায় কথায় আমরা মন্দিরের বাহিরে রিক্সর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে গল্প শোনার সময় আমাদের হাতে নেই। এখনও অনেক কিছু দেখবার বাকি আছে। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের ফিরতে হবে। তাই নব কলেবরের গল্প না শুনে বালককে দক্ষিণা দিয়ে আমি বিদায় দিলাম।

রিক্সয় ঘণ্টু ও পুপু আমার দুধারে বসে। আমার দেহ ভারী নয় বলে তারা স্বচ্ছন্দেই বসে। দুহাত দুজনের কাঁধে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্ষিধে পেয়েছে নাকি ?'

ঘন্টু বড়, সেই আগে বলল, 'না।'

পুপু পরে বলল, 'হোটেলে ফিরে আমরা খাব।'

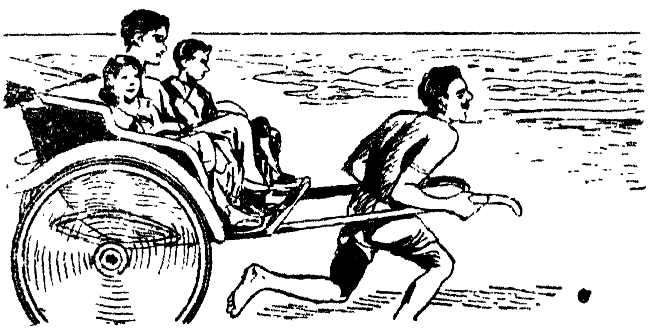
মন্দিরের সামনেই পুরীর বাজার। সব রকমের জিনিসপত্রই এখানে পাওয়া যায়।

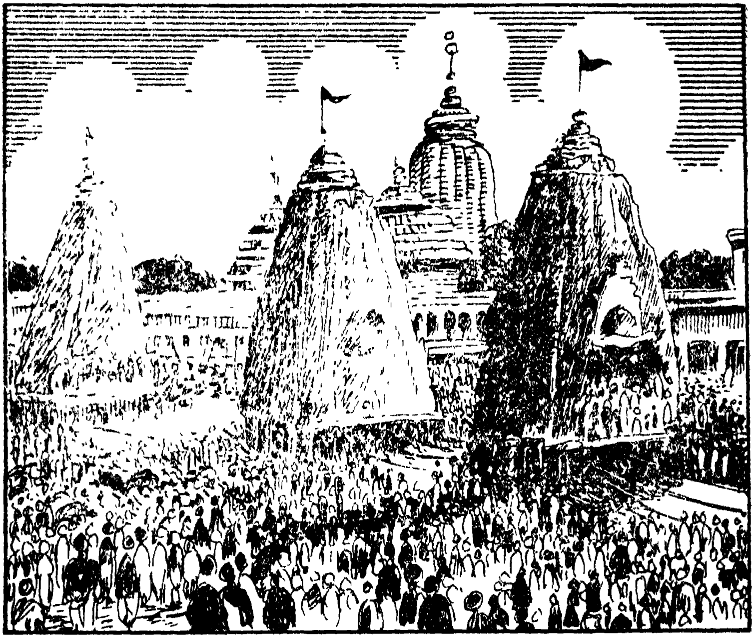
খাবার দোকানও অনেক আছে। কিন্তু বাজারের খাবার খেতে আমার চিরকালের ভয়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে আরও বেশি ভয় হল। রিক্সওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হে, হোটেলে কখন পৌছতে পারব?'

তৎপর ভাবে রিক্সওয়ালা বলল, 'কোথাও দেরি না করলে অন্ধকার হবার আগেই পৌছে দেব।'

'তবে সেই ভাল, হোটেলে ফিরেই আমরা খাব।'

রিক্সওয়ালা অনেকক্ষণ বিশ্রাম করেছে। এবারে আরও জোরে ছুটল।





রথযাত্রার দৃশ্য

খানিকটা দূর এগিয়েই ঘণ্টু বলল, 'নব কলেবরের গল্প আমাদের শোনা হল না।'

হেসে বললাম, 'তার জন্যে বুঝি খুব দুঃখ হচ্ছে!'

ঘণ্টু নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিল, বলল, 'পরে কারও কাছে জেনে নিলেই চলবে।'

আমাদের রিক্সওয়ালা সুযোগ পেলেই কথা বলে। সে বলল, 'বড় দুঃখের কথা।'

'দুঃখের কথা!'

'তা নয়তো কী বাবু! অতবড় উৎসব, কিন্তু গতবারেও ভিতরছা মহাপাত্র মারা গেলেন। পঞ্চাশ সালে তো যাত্রা হয়েছিল, আমরা সবাই দেখেছি।'

এই সংবাদটি আমিও কোথাও পড়েছি বলে মনে হল। তখন আমি ঘণ্টুর চেয়ে কিছু বড়, এ ঘটনা ভুলে যাবার কথ। কিন্তু এ নিয়ে এমন সব আলোচনা শুনেছি যে আজও অনেক কথা মনে আছে।

ভিতরছা মহাপাত্র মন্দিরের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। নব কলেবরের ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। কিন্তু প্রবাদ এই যে নব কলেবরের পর এই মহাপাত্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গতবারে নাকি অনেকেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এবং মহাপাত্রের মৃত্যুর পরে আশ্চর্য হয়েছিলেন। মৃত্যু একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, তবু এই ঘটনা নব কলেবরের অব্যবহিত পরে ঘটেছে বলেই কুসংস্কার বলে সবাই উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

এই উৎসব নাকি জগন্নাথ দেবের সব চেয়ে পুরনো উৎসব। রথযাত্রার চেয়েও পুরনো। জগন্নাথ তখন শবর জাতির দেবতা ছিলেন। হাজার বছর আগে শবররাই তাঁর পুজা করত। তারা ছিল তান্ত্রিক। জৈনরা নাকি কোন সময় জগন্নাথকে নিয়ে গিয়ে প্রাচী নদীর তীরে পুজা করতে শুরু করে। শবররা এই মূর্তি উদ্ধার করে ভাবল, কিছু একটা করা দরকার। অনেক ভেবে চিন্তে তারা দেবতার মূর্তি বদল করে নাম রাখল নীল মাধব। পাঁজি-পুঁথি মিলিয়ে দেখা গেল যে তখন আষাঢ় মাস আর শুধু আষাঢ় মাস নয়, সে বছর দুটো আষাঢ় মাস। কুড়ি বছর পর পর নাকি দুটো আষাঢ় মাস আসে, আর এই রকম আষাঢ় মাসে হয় নব কলেবর যাত্রা।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের মূর্তি পেয়েছিলেন শবরদের রাজা বিশ্বাবসুর কাছে। তাঁর মেয়ের বংশ দ্বৈতা নামে পরিচিত। তাদেরই উপর এই মন্দির দেখাশোনার ভার। তারাই নব কলেবরের ব্যবস্থা করে, আবার পুরানো মূর্তি সমাধিস্থ করে তারাই অশৌচ পালন করে।

যে বছর নব কলেবর হবে সেই বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাসেলি দেবীর কাছে অনুমতি নেওয়া হয়। তারপর নিম গাছ অন্বেষণ। যে কোন নিম গাছ থেকে মূর্তি তৈরি হয় না। তার অনেক রকম চিহ্ন আছে। যে নিম গাছে জগন্নাথের মূর্তি হবে, তার গায়ে চক্রের চিহ্ন থাকা চাই। তাতে সুগন্ধ থাকবে ও ডাল হবে সাতটি। বলরামের মূর্তি হবে যে গাছে, তার রঙ সাদা হবে, আর শঙ্খের চিহ্ন থাকবে গায়ে। সেই গাছে পাখির বাসা থাকবে না, কিন্তু গোড়ায় থাকবে গোখরো সাপের বাসা। লাল রঙের গাছে সুভদ্রার মূর্তি হবে। সেই গাছ জঙ্গলে জন্মালে চলবে না, কোন পবিত্র স্থানে হতে হবে। আর তার ডাল হবে মাত্র পাঁচটি।

প্রাচী নদীর তীরে ককটপুর। সেখানে আছেন দেবী মঙ্গলা। কাঠের জন্য লোকেরা এসে এই দেবীর মন্দিরে ধর্ণা দেবে। দেবী স্বপ্ন দেবেন রাতে—সমস্ত লক্ষণযুক্ত গাছ কোথায় আছে। স্বপ্ন পাবার পর তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গাছ খুঁজতে বেরবে।

নিম গাছ খুঁজে পেলেই তা কাটা হবে না। প্রথমে গাছের নিচে পূজো করা হবে। তারপর সোনার ও রূপার কুঠারে আঘাত করবার পর গাছ কাটা হবে। সেই গাছ মহা সমারোহে আসবে মন্দিরের ভিতর। মূর্তি তৈরি হবে। তারপর ব্রহ্মা স্থাপন।

ব্রহ্মা থাকেন পুরানো মূর্তির ভিতর। ব্রহ্মা কেউ চোখে দেখে নি। পতি মহাপাত্রের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, হাতও কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। তিনি পুরানো মূর্তির ভিতর থেকে ব্রহ্মা বার করবেন। চন্দন ও তুলসীপাতার মধ্যে নাকি ব্রহ্মা থাকেন। সেই চন্দন কোন দিন শুকোয় না, তুলসী পাতাও চির দিন সতেজ থাকে।

আষাঢ় মাসের অমাবস্যার দিন এই উৎসব। মহাপাত্রের কাজ শেষ হয়ে গেলে সাধারণ যাত্রীদের দর্শন। এই প্রথম দর্শনে

অশেষ পুণ্য। তার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। পুরীর পথে তখন চলাফেরার উপায় থাকে না।

নব কলেবর যাত্রার গল্প আমরা পরে শুনেছিলাম। হোটেলের ম্যানেজার একখানি সরকারি বই দিয়েছিলেন, তাতেই এই গল্প ছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সব জায়গা দেখিয়েছে তো?'

বললাম, 'বোধ হয় দেখিয়েছে।'

'লোকনাথ শিব দেখেছেন?'

মণ্টু বলে উঠল, 'দেখি নি তো।'

গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'কপোতেশ্বর আর লোকনাথ শিব ওরা দেখায় না।'

তার পর এই দুই শিবের গল্পও বললেন।

এক বার মহাদেবের নাকি ইচ্ছা হয়েছিল, তিনিও জগতে পূজ্য হবেন। কাজেই জগন্নাথ দেবকে সন্তুষ্ট করা দরকার। বিরজা মণ্ডল ও নীলাচলের মধ্যে কুশস্থলী এক ভয়ানক স্থান। জল নেই, বৃক্ষলতা নেই। মহাদেব সেখানে জলাশয় খনন করলেন, উদ্যান রচনা করলেন সুদৃশ্য বৃক্ষলতার। তার পর তপস্যার ক্লেশে কপোতাকার ধারণ করলেন। জগন্নাথ এই কাজে সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কৃপাতেই মহাদেব এইখানে কপোতেশ্বর নামে পূজা পাচ্ছেন।

লোকনাথ মহাদেবেরও এমনি একটি কাহিনী আছে। সে রামায়ণের যুগের কাহিনী। রাম সীতা উদ্ধারে চলেছেন। এই নীলাচলের পশ্চিমে শবরদের দেশে এসে কোন শিবলিঙ্গ পেলেন না। অথচ তাঁকে শিবপূজা করতে হবে। তখন এক শবরের দেওয়া একটি লাউ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন। সেই শিব আজ লাউকনাথ বা লোকনাথ নামে পরিচিত। শিবরাত্রিতে এখন এখানে মেলা হয়।

এ সব গল্প আমরা হোটেলে ফিরে শুনেছিলাম। রিক্সওয়ালা

এ সব জায়গায় আমাদের নিয়ে যায় নি। পুরীর মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা একটা মঠে এনে হাজির করেছিল। তার নাম জগন্নাথবল্লভ মঠ। সদর রাস্তার ধারে প্রশস্ত উদ্যানের ভিতর একটি মনোরম স্থান। আমরা অল্পক্ষণের জন্য সেখানে নেমেছিলাম।

একদা পুরীর কোন রাজা ভুল করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন বাম হাতে। তারপর ভুল বুঝতে পেরে গভীর ক্ষোভে সেই হাতটি কেটে ফেলে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। সেই হাত নাকি একটি বৃক্ষরূপে আজও এই বাগানে আছে। কিন্তু কোন্ গাছটি তা আমরা জানতে পারলাম না।

এই মঠের কাছেই নরেন্দ্র সরোবর। স্বচ্ছ জলের বিরাট পুকুর। লোকে চন্দন পুষ্করিণী বলে।

এরই ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আমরা আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে গেলাম। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি স্বর্গে গেছেন। এক জায়গায় তাঁর উপদেশ লেখা আছে।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমো ধর্মঃ।

৪। সর্ব জীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

মনোযোগ দিয়ে আমরা এই উপদেশগুলি পড়ছিলাম। শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'শেষ কথাটার মানে কী ছোটকা?'

বললাম, 'অহংকারের চেয়ে খারাপ জিনিস আর কিছু নেই।'

পুপুরও কিছু প্রশ্ন করা দরকার। সে বলল, 'এ সব কার কথা ছোটকা?'

বললাম, 'একজন মহাপুরুষের।'

দুজনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাদের আগ্রহ দেখে বললাম, 'ছোট থেকেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। কেউ তাঁর যত্ন করলে ভাবতেন যে তাকে তিনি ঠকাচ্ছেন, লোকের কাছে যত্ন পাবার যোগ্যতা তাঁর নেই।'

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি একটা ভারি সুন্দর কথা বলেছিলেন। জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে অনেক সাধু ঠকিয়েছিল। তাই তিনি একবার বিজয়কৃষ্ণের কাছে সাধুর লক্ষণ জানতে লোক পাঠিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ জানিয়েছিলেন যে যিনি নিজের প্রশংসা করেন না, পরের নিন্দা করেন না, আর ধনীর অতিথি হন না, তিনিই সাধু।

এই নিঃসম্বল সাধু পুরীতে এসে ধনী হয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে অঞ্জলি ভরে দিয়েছিল, প্রাণের আবেগে দিয়েছিল। প্রতিদানে তিনি তাদের কী দিয়েছিলেন তা তারাই জানে।

সমাধি মন্দিরে আর একটি সুন্দর কথা লেখা আছে।—এইছা দিন নাহি রহে গা। এমন দিন থাকবে না। একদিন ভাল দিন আসবে।

একটুখানি এগিয়েই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আশ্রম। এটিও নিরিবিলি নির্জন স্থান। আশ্রমই বটে। কিন্তু আমরা সেখানে সময় না কাটিয়ে গ্রাম্য পথে আঠারো নালা দেখতে গেলাম। সহর ছাড়িয়ে সেই মনোরম স্থান। রাস্তার ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, দিগন্ত বিস্তৃত। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য।

ঘণ্টু বলল, 'এ আবার দেখবার কী জিনিস!'

উত্তর দিল রিক্সওয়ালা, বলল, 'এ নালা নয় খোকাবাবু, এ নদী, নাম ভাগীরথী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই প্রতি বারো বছরে সমুদ্রের পূজো হয়।'

'তবে আঠারো নালা নাম কেন হল ?'

'সে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার জন্যে। নিজের আঠারোটা ছেলেকে তিনি এখানে কেটেছিলেন।'

পুপু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন কেটেছিলেন ?'

রিক্সাওয়ালা এ কথার উত্তর দিতে পারল না।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেশের কোন উপকারের জন্য এই কাজ করেছিলেন।'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'এই ধানের ক্ষেতের নাম লক্ষ্মীজলা। এই জমিতে বারো মাস ধান হয়।'

বলে রিক্সার মুখ ফেরাল।

আকাশের রোদ এখন আর তেমন তীব্র নয়। মিষ্টি হাওয়ায় মন প্রসন্ন হয়ে উঠছে।

জেলখানার পাশ দিয়ে আমরা যে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, সেইটিই পুরীর প্রধান রাজপথ। মন্দিরের সামনে থেকে বেরিয়ে গুণ্ডিচা বাড়িতে শেষ হয়েছে। লম্বায় প্রায় দু মাইল হবে। গুণ্ডিচা বাড়ির ফটকের সামনে এসে আমরা রিক্সা থেকে নামলাম।

পুপু চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানেও একটা হাতি ছাটকা!'

সামনেই একটা হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে শুঁড় নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। মন্টু আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল 'ভয় কিসের, পিঠের ওপর তো মাহুত বসে আছে।'

আমরা কিন্তু হাতির ভয়ে পালিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

বাইরে থেকে এই মন্দিরকে জেলখানা বলে মনে হয়েছিল। ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। পশ্চিমে সিংহদ্বার ও বিজয় দ্বার উত্তরে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে আসেন, আর

উল্টোরথে বাহির হন বিজয় দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা নাকি এই গুণ্ডিচা বাড়িতেই জগন্নাথের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

'গুণ্ডিচা নাম কেন হল?'

'এখানকার লোকে বলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী ছিলেন গুণ্ডিচা। তাঁরই নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মন্দিরের মধ্যে আমরা কালো পাথরের একটা রত্ন বেদী দেখতে পেলাম। রথযাত্রার দিন থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত জগন্নাথ এই বেদীর উপর অবস্থান করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি এক যজ্ঞের দক্ষিণায় অনেক গাভী দান করেছিলেন। সেই সব গরুর ক্ষুরে এই বিরাট গর্ত হয়েছে, আর জলাশয় হয়েছে উৎসর্গের জলে। এখানে স্নান করলে নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-লাভ হয়।

জলের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টু বলল, 'কিন্তু স্নান করবে কা করে? কাছিমে যে খেয়ে ফেলবে!'

সত্যিই এখানে অসংখ্য কচ্ছপ, জল যেন কালো হয়ে আছে। এখানকারই একজন লোক আমাদের বলল যে এই কচ্ছপেরা মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশধর। রাজার ধারণা ছিল যে বংশ থাকলেই কীর্তিনাশ হয়। তাই তিনি জগন্নাথের কাছে বংশলোপের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। জগন্নাথ তাঁর বংশও রাখলেন, আবার কীর্তিনাশও হতে দিলেন না। তারা কচ্ছপ হয়ে বেঁচে রইল।

এই সরোবরের তীরে আমরা নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির দেখলাম।

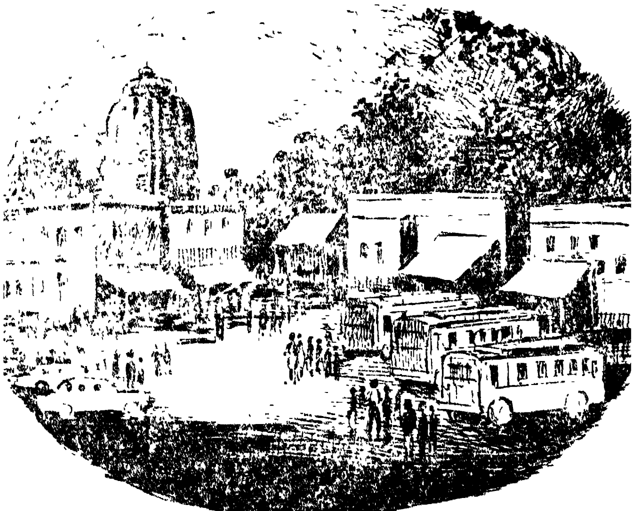
এখানে যখন রিক্সায় চাপলাম, তখন বেলা পড়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর আমাদের কতক্ষণ লাগবে?'

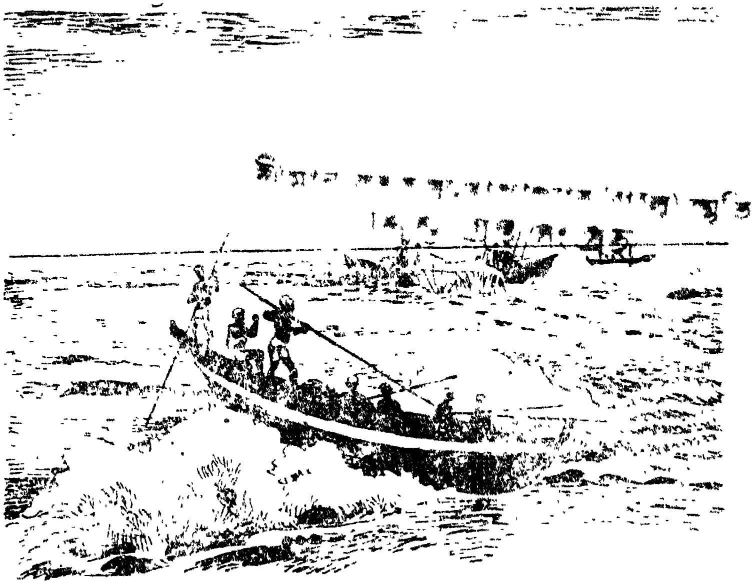
রিক্সওয়ালা বলল, 'চক্রতীর্থে সোনার গৌরাঙ্গ দেখলেই শেষ।'

সমুদ্র তীরে একটি ছোট সরোবর, তারই নাম চক্রতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন প্রভাস তীর্থে। যে গাছটির উপর দেহত্যাগ করেছিলেন, এক দিন সেই গাছটিই ভেসে এসে এই চক্রতীর্থে ঠেকল। লোকে বলল, দারুব্রহ্মের আবির্ভাব হল। দারু মানে নিম গাছ। নিম কাঠের ঠাকুর।

আমরা চক্রনারায়ণ দেখলাম, তারপর দেখলাম সোনার গৌরাঙ্গ।

ফেরার পথে রেলের বিরাট হোটেলও দেখলাম।





সমুদ্রে মাছ ধরার দৃশ্য

শহর ছেড়ে সমুদ্রের ধারে আসতেই তার ডাক আমার কানে এল। মেঘের ডাকের সঙ্গে সমুদ্রের ডাকের অনেক তফাৎ আছে। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনায়, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। যত জোরে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘও তত জোরে ডাকে। তার কত বিচিত্র শব্দ। কত অস্থির, কত দুরন্ত। সমুদ্রের অন্য রূপ। সমুদ্র সারা দিন ডাকে, সারাক্ষণ ডাকে, সমুদ্রের ডাকের কোন শেষ নেই। তার সুর এক, শব্দ এক, তার ডাক স্থির ও গম্ভীর। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই ডাক শুনি, সমুদ্রের থেকে দূরে গিয়েও এই ডাক শুনি মনের কান দিয়ে। মেঘের ডাক বলতে কোন একটা বিশেষ সুর আমাদের কানে বাজে না, কিন্তু সমুদ্রের ডাকের নামে হৃদয়ে দোলা লাগে, মন ভরে। পুরীতে কয়েক দিন থেকেই আমি এই কথা উপলব্ধি করেছিলাম।

সমুদ্রের উপরে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। তার আগে সমুদ্রের

জল সাদা দেখাচ্ছিল। এনামেল পেইন্টের মতো ঝকঝকে সাদা। আর নীল রেখা দেখেছি তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে। নানা রঙে আলো করা পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু সেই সাদা জল ঠিক নীল হল না। ধূসর হল, কালচে ছাইএর মতো একটা গম্ভীর রঙ হল।

অন্ধকারেও আমি সমুদ্র দেখেছি। বিশাল সমুদ্র। তখন তাকে দাম্ভিক উদ্ধত মনে হয়েছে। আপনার অস্তিত্ব প্রমাণে সারাক্ষণ সচেষ্ট। ঢেউএর আঘাতে পৃথিবীকে নিপীড়িত করছে, আর গম্ভীর গর্জনে ঘোষণা করছে আপনার জয়ধ্বনি। এই গর্বিত সমুদ্র যেন সমস্ত সৃষ্টিকে বিদ্রূপ করছে।

পর দিন প্রত্যূষে আমি সমুদ্র দেখলাম। কিন্তু তখনও জলের রঙ নীল হয় নি।

শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের ভিতরের অন্ধকার পাথরের মতো ভারি মনে হয়েছে। বাহিরের স্বচ্ছতা জানালার কাছেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের ডাক কিছুতেই ফুরোচ্ছে না।

বাহিরে বেরিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। পৃথিবীর এ কী রূপ! সামনের পথ আর বালি ডিঙিয়ে পৃথিবীটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সমুদ্র নেই, আকাশ নেই। শুধু একটা নীল পর্দা দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপরে যদি আকাশ থাকে, সেই আকাশেরই প্রান্ত দেখছি চোখের সামনে। পর্দার মতো তার নিচেটা অল্প অল্প দুলছে।

সমুদ্রের কাছে এসে আরও আশ্চর্য হলাম। আরও অনেকে সূর্যোদয় দেখতে এসেছে। আর পূবের আকাশে তখন প্রতিমুহূর্তে রূপ পরিবর্তন হচ্ছে। কত বিচিত্র রঙ! শিল্পীর রঙের বাক্স বুঝি উল্টে গেছে। এত রূপ এত রঙ তার সারা দিন কোথায় থাকে!

দিগন্তের নিচে থেকে সূর্য উঠছে। চাঁদের মতো স্নিগ্ধ সূর্য, একটু বেশি লাল, কতকটা সিঁদুরের মতো। খানিকক্ষণ পরে আর চাঁদের মতো সোনালী হবে না, হবে রূপোর মতো সাদা।

জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ আলো ঝরবে না. বিদ্যুতের মতো তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লাগবে।

মনে হচ্ছে, চুম্বকের মতো একটা শক্তি সূর্যকে দিগ্বলয়ের নিচে টেনে রাখছে। সূর্যকে আর গোল দেখাচ্ছে না। কলসের মতো আকার হয়েছে। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হল যে নিচের আকর্ষণ তার ছিঁড়ে গেল। এক লাফে খানিকটা উঠেই সূর্য আবার গোল হয়ে গেল।

দূরে বুঝি সমুদ্রের সীমা দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্র ফুলে উঠে আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

খানিকটা তফাতে স্থির জল অজগরের ফণার মতো উঁচু হয়ে উঠছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ফণা তীরের উপর আছড়ে পড়ছে না। কাছাকাছি এসেই ফেটে-ভেঙ্গে জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছে। একরাশ সাদা জল নীল জলের উপর পড়ে তীরের কাছটা তোলপাড় করে দিচ্ছে। কলকল করে পারের দিকে আসছে, আর ফেণায় সাদা করে দিচ্ছে মাটি। সেখানকার বালিও জল বলে মনে হচ্ছে।

এত বড় সমুদ্রে এই খেলা যেন খেলা নয়, এ চঞ্চলতা যেন চঞ্চলতা নয়। সমুদ্রের গর্জনকেও গর্জন বলে মনে হচ্ছে না। এমন উদার এমন বিরাট এই সমুদ্র যে তাকে আকাশের মতো অসীম শান্ত স্তব্ধ মনে হচ্ছে। নিজের কথা আর মনে থাকে না, নিজের বেদনা ও ভাবনার কথা। বৃহতের সামনে এসে মানুষ বোধ হয় ক্ষুদ্রতাকে ভুলতে পারে।

অনেক দূরে দূরে এক একটা দাগের মতো কালো জিনিস দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছিল। যেন একটি ঢেউএর মাথায় উঠেই আর একটা ঢেউএ আড়াল হয়ে যাচ্ছে এগুলি নাকি জেলেদের নৌকো। শেষ রাত্রে তারা মাছ ধরতে বেরিয়েছে, এখন একে একে ফিরছে

এক জায়গায় জেলেরা জলে নামার উদ্যোগ করছিল। তাদের ছোট ছোট কাঠের নৌকো তীরের উপরে তোলা আছে। কালো কালো কতগুলো মানুষ বিরাট লম্বা জাল নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর সমুদ্রে নামবে। ভাসতে ভাসতে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। এরা এখন ফিরবে না, এরা জাল গোটাবে অপরাহ্লে। তারপর একে একে ফিরে আসবে।

এক জায়গায় কিছু লোক কৌতূহলে ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। ভিতরে উঁকি দিয়ে আমি মাছ দেখতে পেলাম। ছোট ছোট মাছে জাল ভর্তি হয়ে গেছে। জেলেরা জাল থেকে ছাড়িয়ে সেই মাছ নৌকোর মধ্যে রাখছে।

আর একখানা নৌকো এল তীরের কাছে। জেলেরা জলের উপর লাফিয়ে পড়ে সেটা টেনে শুকনো ডাঙ্গার উপর সরিয়ে আনল।

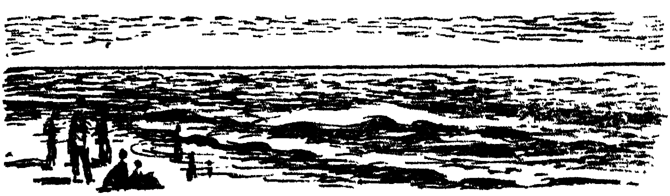
এই লোকগুলোর শক্ত দেহ কালো পাথরের মতো মজবুত মনে হয়। রোদে জলে ঝড়ে নির্বিকার ভাবে সমুদ্রে নামছে, ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করে পয়সা আনছে জীবন ধারণের জন্য। শেষ রাত থেকে শেষ বেলা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম। তার উপরে উটকো কাজ। নৌকো আর জাল মেরামত লেগেই আছে। কখনও হাতুড়ি, কখনও সূঁচ। মেয়েরা মাছ বিক্রি করে, পুরুষেরা যাত্রীর হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করায়। অদ্ভুত জীবন। সমুদ্র নিয়েই তারা বেঁচে আছে।

এদের আমি দুপুর বেলাতেও দেখেছি পরে। মাছ ধরার বড় বড় জাল তারা উত্তপ্ত বালির উপর বিছিয়ে বসেছে। নিঃশব্দে মেরামত করে চলেছে। কারও মাথায় সাদা টুপি, কারও কাপড় জড়ানো মাথা। দূরে দূরে বসেছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

এদের সঙ্গে আমি ঘুমন্ত মানুষও দেখেছি। উদার আকাশ থেকে তখন উত্তাপ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রসারিত সমুদ্র সৈকতের কোনখানে একটু ছায়া নেই। তবু কতগুলো মানুষ এই গরম বালির উপর নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ঘুমচ্ছে। ছোট বড় অসংখ্য নৌকো বালির উপর ইতস্তত ছড়ানো। তারই গা ঘেঁসে একটুখানি ছায়া। সেই ছায়ায় শুয়ে ঘুমচ্ছে। কেউ আবার এক খণ্ড কাপড় টাঙ্গিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রের গর্জন এদের কাছে ঘুম পাড়ানি গান।

এক দিন এদের বাসস্থানও আমি দেখে এসেছিলাম। সমুদ্রের তীরে যে বাঁধানো সড়ক, তারই সমান্তরাল রাস্তা প্রথম সারির বাড়িগুলোর পিছনেই। কিন্তু এই রাস্তায় পৌছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে এও পুরীর পথ। দুধারে অসংখ্য খড়ের ঘর। মাঝখানটা প্রশস্ত বটে, কিন্তু ধুলোয় অপরিচ্ছন্ন। মনে হবে, পায়ে পায়ে সমুদ্রের সমস্ত বালি এসে এইখানে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের মানুষগুলোর গায়ে লোনা জলের প্রলেপ যায় শুকিয়ে, কিন্তু পায়ের বালি ঘরের দুয়ার পর্যন্ত চলে আসে। ছোট ছেলেদের পায়ে পায়ে সেই ধুলো উড়ছে। ছেলেরা চক্রাকারে কোন খেলা খেলছিল।

সকাল বেলায় সমুদ্রের ধারে আমি বেশি সময় কাটাই নি। আজ আমাদের ভুবনেশ্বর যাবার কথা। ঘণ্টু ও পুপু এতক্ষণে হয় তো জেগে উঠেছে। তাদের সঙ্গে বেরবার জন্য তৈরি হতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম।





সাক্ষীগোপাল

সকাল বেলার চা খেয়ে আমরা মোটর বাসে উঠলাম। হোটেলের বেয়ারা আমাদের দুপুরের খাবার টিফিন কেরিয়ারে ভরে গাড়িতে তুলে দিল।

চারি দিকে চেয়ে ঘণ্টু বলে উঠল, 'এ আবার কেমন বাস!'

পুপু বলল, 'আমাদের স্কুলের বাসও যে এর চেয়ে অনেক বড়।'

সত্যিই তাই। এ বাস স্টেশন ওয়াগনের চেয়ে কিছু বড়। পনর ষোল জন যাত্রী স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, এমন ব্যবস্থা। দু তিনটে হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই বাস ভরে গেল, তারপরে ছাড়ল। সকালের রোদ তখনও প্রখর হয় নি।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর ট্রেনে আটত্রিশ মাইল পথ, খুর্দা রোড জংসন হয়ে কলকাতার দিকে। দু ঘণ্টার পথ। মোটরে পথও কম, সময়ও সংক্ষেপ হয়। মাঝ পথে পিপ্‌লি নামে একটা জায়গা থেকে কোনারকের রাস্তা বেরিয়েছে। পুরী থেকে কোনারক আর ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক প্রায় একই রকমের দূরত্ব। সামান্য

পথ যা কাঁচা আছে, অদূর ভবিষ্যতে তা পাকা হয়ে যাবে। কোনারক দর্শনের কষ্টের কথা মানুষ তখন অবিশ্বাস্য ভাববে।

বড় রাস্তায় পৌঁছে বাস যখন জোরে ছুটল, তখন আবার পুপু কথা কইল। জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ছোটকা?'

উত্তর দিল ঘণ্টু, বলল, 'প্রথমে সাক্ষীগোপাল, তারপরে ভুবনেশ্বর।'

পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল বারো মাইল উত্তরে। ঠিক হয়েছিল, সাক্ষীগোপাল দেখে আমরা ভুবনেশ্বরে যাব। ফিরব উদয় গিরি খণ্ড গিরি দেখে। শীতের বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। চোখ বুজে সেই বাতাস উপভোগ করা ছাড়া এখন আর কোন কাজ নেই।

সকালের এই স্নিগ্ধ বাতাসে বোধ হয় ঘুম আসে। কখন আমরা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছি, লক্ষ্য করি নি। বোধ হয় কোন সময় প্রধান রাজপথ ছেড়ে আমরা অন্য পথে এসেছি। তারপরেই বুঝতে পারলাম যে এটি সাক্ষীগোপালের পথ। আমাদের বাস একটি ছোট বাজারের ভিতর এসে দাঁড়াল। আমরা সবাই সেখানে নেমে পড়লাম।

প্রশস্ত বাঁধানো পথ মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনেই উঁচু অরুণ স্তম্ভ। তোরণের নিচ দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

এই সুন্দর ছোট মন্দিরটি উড়িষ্যার নিজস্ব রীতিতে তৈরি। মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মতো অপর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে ছিল না। বাস থেকে নামবার সময় ড্রাইভার আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি আমরা দেবতার দর্শন করে বেরিয়ে এলাম।

যাত্রীরা সচরাচর এখানে ট্রেনেই আসেন। পুরী-খুর্দা রোড

শাখা লাইনে সাক্ষীগোপাল একটি ছোট স্টেশন। মন্দির আধ মাইলের মধ্যে। মন্দিরের পাশে একটি সরোবরও আছে। তাড়াতাড়ি করে তাও আমরা দেখে নিলাম। দক্ষিণ ভারতের মতো বাঁধানো পুষ্করিণী নয়, গ্রামের পুকুরের মতো। চারি পাশে সবুজ গাছে ছেয়ে আছে। মনে হয়, যাদের সময় অপর্যাপ্ত তারা এখানে সারা দিন কাটিয়ে তৃপ্তি পাবেন। গুপ্ত বৃন্দাবন এই বাগানের নাম, সার্থক নাম।

বাসে উঠে পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'সাক্ষীগোপাল নাম কেন হল ছোটকা?'

এই দেবতার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমি তাদের বললাম। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক ভক্তের মামলায় সাক্ষী দিতে বিদ্যানগরে এসেছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম দেব পাঁচশো বছর আগে এই নগর জয় করে বিগ্রহের অধিকার পেয়েছিলেন। তিনি বিগ্রহ স্থাপন করেন কটকে। নীলাচল পরিক্রমায় এসে চৈতন্যদেব এই মূর্তি কটকেই দেখেছিলেন। মোগল আমলে বোধহয় এই মূর্তি সত্যবাদী গ্রামে তুলে আনা হয়। এই গ্রামেরই নাম সত্যবাদী।

ঘণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'কৃষ্ণ কোন্ মামলায় সাক্ষী দিয়েছিলেন?'

কোন ভক্তের বিপদের একটা কাহিনী নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে দেবতা কেন ছুটে আসবেন। কিন্তু সে কাহিনী আমার জানা ছিল না বলে বলতে পারলাম না।

পথে এক ভদ্রলোক উড়িষ্যার অনেক কথা আমাদের শোনালেন। ট্রেনের এক যাত্রীর কাছেও এ সব কথা আমি শুনেছিলাম। ভদ্রলোক বললেন, সমুদ্র আর মন্দিরে উড়িষ্যার শেষ নয়, এখানেও আধুনিক সভ্যতার প্রসার হচ্ছে। সম্বলপুর এলাকাতেই নতুন উড়িষ্যা জাগছে। সম্বলপুরে অ্যালুমিনিয়ম ফ্যাক্টরি, ব্রজরাজনগরে কাগজের কল। মহানদীর উপরে হীরাকুদ বাঁধ আর রাউরকেলায়

ইস্পাতের কারখানা। সবই কাছাকাছি। কলকাতা-মাদ্রাজ লাইনে কটক, আর কলকাতা-নাগপুর লাইনে রাউরকেলা প্রায় সমান রাস্তা। রাউরকেলা থেকে সম্বলপুর শাখা লাইন। কটক থেকে সম্বলপুরের পাকা রাস্তা সোজা উত্তরে গেছে। সম্বলপুর থেকে ছ মাইল উত্তরে মহানদীর দুই ধারার মধ্যে হীরাকুদ একটি দ্বীপ ছিল। নতুন বাঁধ হয়ে তার রূপ একেবারে পালটে গেছে। তেমনি রাউরকেলার চেহারা।

ভদ্রলোক বললেন, 'পুরনো উড়িষ্যার পাশে নতুন উড়িষ্যা কেমন করে গড়ে উঠছে, ওখানে গেলেই তা দেখতে পাবেন। বড় দরিদ্র দেশ, বড় নির্যাতিতের দেশ। এ দেশের মানুষ বড় অবহেলার মধ্যে কোন রকমে বেঁচে ছিল। স্বাধীনতার পর আমাদের ঘুম ভেঙ্গেছে, আমরা জেগেছি। মানুষের মতো বাঁচার চেষ্টা আমাদের শুরু হয়েছে।

উড়িষ্যার পুরনো রাজধানী ছিল কটকে। মহানদী আর কাঠজুরি এই দুই নদী কটককে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে। শহর বাড়াবার প্রয়োজন হল, অথচ তার উপায় নেই। স্থানাভাবে রাজধানীকে ভুবনেশ্বরে উঠিয়ে আনতে হল।'

কটকের উপর দিয়ে আমরা পুরী এসেছি, কিন্তু তখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। কিছুই দেখতে পাই নি। কটকে এখন লোকে রাজা অনঙ্গ ভীমের তৈরি বড়বাটির দুর্গ দেখে, আর দেখে রাজা মুকুন্দ দেবের প্রাসাদের চিহ্ন। দুর্গের দুধারে পাথরের প্রাচীর, আর পরিখা চারি দিক ঘিরে। ভিতরে এক পাথরের স্তম্ভে রাজার পতাকা উড়ত। এই দুর্গের মধ্যেই রাজা মুকুন্দ দেবের নতলা উঁচু প্রাসাদ ছিল। আজ তার একটি তলও অবশিষ্ট নেই।

কাঠজুরি নদীর বাঁধ প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো। কেশরী রাজারা এই বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। বন্যার হাত থেকে আজও তাই শহরটা রক্ষা পাচ্ছে।

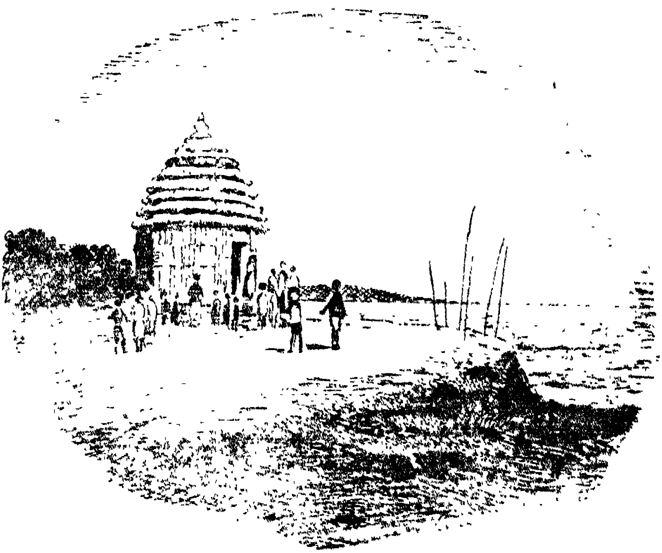
কটক থেকে রাজধানী উঠে গেছে সত্যি, কিন্তু তাই বলে শহরের উন্নতি বন্ধ হয়ে যায় নি। থার্মাল স্টেশন আর কাগজের কলের পরিকল্পনা, কলিঙ্গ রেফ্রিজেরেটার কর্পোরেশন, কোল্ড স্টোরেজ প্লান্ট, কাপড় আর কাচের কারখানা, এ সব দেখবার মতো।

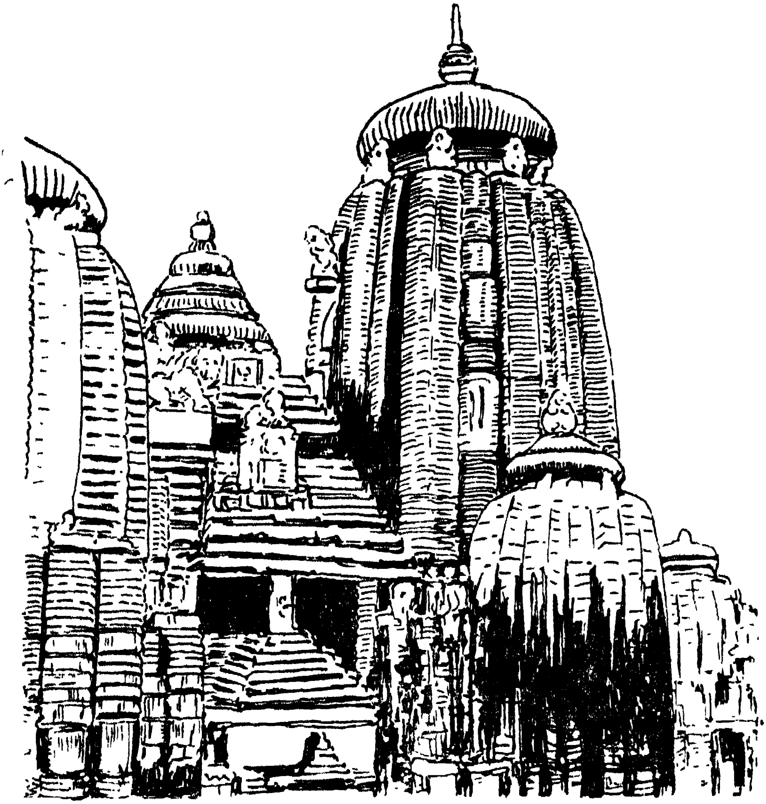
উড়িষ্যায় আর একটি স্বল্পপরিচিত তীর্থস্থান আছে। তার নাম যাজপুর। সাধারণ লোকের কাছে তেমন পরিচিত না হলেও মহাভারতের বনপর্বে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন। বৈতরণীর তীরে এই তীর্থে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে নাম হয়েছিল যজ্ঞপুর। যজ্ঞপুর থেকেই যাজপুর। দেবী দুর্গা এখানে বিরজামূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন বলে অনেকে এই তীর্থকে বিরজাক্ষেত্রও বলে।

অন্য এক পুরাণে গয়াসুরের গল্প আছে। বিষ্ণুর তপস্যা করে গয়াসুর বর পেয়েছিল যে তার দেহ এমন পবিত্র হবে যে তাকে দেখেই সকলে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠে আর জায়গা নেই, অথচ যমপুরী একেবারে ফাঁকা, পাপীরা সব স্বর্গে পৌঁছে গেছে। দেবতারা তখন ভেবে চিন্তে স্থির করলেন যে গয়াসুরকে নিশ্চল করতে হবে। কাজেই তাঁরা তার কাছে এসে গয়াসুরের দেহটা ভিক্ষা চাইলেন। গয়াসুর বড় ধার্মিক, তখনই রাজী হয়ে শুয়ে পড়ল। দেবতারা তার দেহের উপর প্রকাণ্ড একখানা শিলা রেখে সবাই তার উপর উঠলেন। কিন্তু তাতেও গয়াসুর নিশ্চল হল না। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুকে এসে সেই শিলায় উঠতে হল। গয়াসুর তখন নিশ্চল হল। সে বুঝতে পারল যে এ সব দেবতাদের কৌশল। তাই বলল, এত পরিশ্রমের তো কোন দরকার ছিল না, আমাকে বললে আমি নিজেই নিশ্চল হতাম। দেবতারা তার বিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বর নাও। গয়াসুর বলল, এই শিলার উপরেই আপনারা অধিষ্ঠান করুন।

গয়া মহাতীর্থ হল। শুধু গয়া নয়, যাজপুর আর পীঠাপুরমও। গয়াসুর যখন শুয়েছিল তখন তার মাথা ছিল গয়ায়, নাভি যাজপুরে আর পীঠাপুরমে পা। এই তিনটি স্থানই তাই তীর্থ হয়েছে।

সুন্দর প্রশস্ত পথ ধরে আমাদের বাস ছুটেছিল। দুধারে গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র। স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, মন ভরে যাচ্ছে খুশিতে। এক সময় আমরা ভুবনেশ্বর শহরে পৌঁছে গেলাম।





ভুবনেশ্বরের মন্দির

জনবহুল পথ অনেকটা অতিক্রম করে লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনের রাস্তায় এসে বাস দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লাম। ওধারের বড় গাছটার নিচে বাস আমাদের অপেক্ষা করবে।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর। একদা এখানে নাকি সাত হাজার মন্দির ছিল। আজও আছে শ পাঁচেক মন্দির। সবই ভেঙ্গে পড়ে নি, অনেক মন্দির আছে সগৌরবে দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধান করলে মন্দিরের এই প্রাচুর্যের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। জন্মের তিন শো বছর আগে থেকেই এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন প্রভাবও ছিল। পাঁচ ছ মাইল দূরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তার প্রমাণ বহন করছে, প্রমাণ আছে ধৌলিতে অশোকের শিলালিপিতে। হঠাৎ একদিন এ অঞ্চলের লোক বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইল। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শেষে যযাতি হলেন দেশের রাজা। রাতারাতি তিনি দেশের চেহারা বদলে দিলেন। লিঙ্গরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। পাঁচ শো বছর ধরে এই মন্দিরকে ঘিরে নূতন নূতন মন্দির নির্মিত হল। এ শুধু প্রেরণা নয়, এ পাগলামি। ধর্মের নামেও মানুষ পাগল হয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ঘণ্টু ও পুপুর সঙ্গে আমিও অভিভূত হয়ে গেলাম। এমন বিশাল মন্দির বুঝি আমি আগে কখনও দেখি নি। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দেখেছি ঠিক, কিন্তু সে কথা এখন মনে পড়ল না। মনে পড়ল, দক্ষিণ ভারতের গোপুরের কথা। গোপুর মন্দির নয়, মন্দির প্রবেশের দ্বার। শুনেছি যে মন্দিরের চেয়ে সেখানে গোপুরের উচ্চতাই বেশি।

লিঙ্গরাজের মন্দির একেবারে অন্য রকম। শুধু উঁচুতে নয়, ছোট ছোট অসংখ্য মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গণ ছেয়ে আছে। গায়ে গায়ে মন্দির, কারুকার্যে কণ্টকিত। কাছে যাবার আগে আমরা দূর থেকে এই মন্দিরের শোভা দেখলাম।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলোর একটা বিশিষ্ট গঠনরীতি আছে। সব চেয়ে উঁচু শিখরের নাম বিমান। তারপর জগমোহন, নাটমন্দির, একেবারে এধারে ভোগমন্দির। এই চারিটি অংশ নিয়ে একটি মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে। বিমানটি বোধ হয় সোয়াশো ফুটের উপর হবে।

দু একজন যাত্রী মন্দির গাত্রের ছবি নিচ্ছিলেন। উপরের ছবি তুলছিলেন কষ্ট করে। নিচে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আমার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। এ তো মন্দির নয়, এ কোন

শিল্পীর স্বপ্ন। পাথরে সেই স্বপ্নের রূপ দিয়েছে। অনন্ত কাল স্বপ্ন দেখবে, কিছুতেই সে ঘুম আর ভাঙবে না।

বিমানের যে অংশ দূর থেকে দেখা যায়, কারুকার্যের বাহুল্য তাতে নেই। পিরামিডের মতো তার দেহ সমতল নয়, গম্বুজের গায়ের মতোও মসৃণ নয়। কতকটা ঢেউ খেলানো। ঢেউ উপর থেকে নিচে। আর তার উপর আঁজি, ঘন বেড় দেওয়া। দূরে না গেলে মন্দিরের এ অংশ চোখে পড়ে না। নিচে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত।

মন্দিরের গায়ে সমতল স্থানের যেন একান্তই অভাব। পাশাপাশি থাম উঠেছে। সে থাম গোল নয়। চার কোণাও নয়। মন্দিরের গা থেকে ধাপে ধাপে সামনে এসে পাশে নেমেছে, আবার এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ মন্দির চতুষ্কোণ নয়, ছয় কোণ আট কোণও নয়। শত সহস্র কোণে কণ্টকিত। নিচু স্থানগুলোতে আলো পৌঁছয় না, কিন্তু শিল্পীর দক্ষ হাত সর্বত্র পৌঁছেছে।

থামগুলিও সমতল নয়। নানা ঢঙের নানা আকারের কার্নিসে পূর্ণ। মাঝখানের স্থানগুলিতে মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। চারি দিকে লতাপাতার সূক্ষ্ম কাজ। মাঝে অপূর্ব ভঙ্গিতে নানা মূর্তি। দেবদেবীর সঙ্গে নায়িকা অলসকন্যার মূর্তি আছে, পৌরাণিক প্রাণী আছে. মিথুন মূর্তিও আছে। মূর্তির শেষ নেই। নিচের মূর্তিগুলির চেয়ে উপরের মূর্তিগুলি বুঝি আরও সুন্দর।

যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূজো করবেন বাহিরে তাঁরা ফুল বেলপাতা কিনেছেন। আমাদের মতো মন্দিরের দেওয়াল দেখতে না এসে তাঁরা সোজা ভিতরে চলে গেছেন। মন্দিরের চেয়ে তাঁদের কাছে মন্দিরের দেবতা বড়। পুরাকালে এই বিধিই ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রী আসত দেব দর্শনে। তাদের জন্য বিরাট প্রাঙ্গণ তৈরি হত, বিপুল জলাশয়। স্নানাহ্নিক করে তারা এই

প্রাঙ্গণে এসে জমা হত। দেবতা আছেন বাতায়নহীন অন্ধকার গর্ভ গৃহে। দিনে রাতে সমান অন্ধকার। মিট মিট করে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। ধূপে ও ধুনায় বাতাস অসাড় হয়ে গেছে, ফুল ও চন্দনের সুগন্ধে আকুল হয়ে আছে দশ দিক। ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করছেন। মন্ত্র পড়াচ্ছেন। গম্ভীর উদাত্ত স্বরে গম গম করছে মন্দিরের অভ্যন্তর। যাত্রীর জনতা এক সঙ্গে এসে কোলাহল করবে না। আসবে একে একে, মাথা নত করে, ফুল চন্দন নৈবেদ্য হাতে। পূজা করবে, যা কিছু নেবার আছে নেবে, বুক ভরে নেবে অমূল্য ঐশ্বর্যে। তারপর বেরিয়ে যাবে। এমনি করে সকল যাত্রী দেখবে দেবতাকে।

আজ পৃথিবীর রূপ বদলেছে, রীতিও বদলেছে। আজ আমরা দেবতার বদলে দেখি মন্দিরের কারুকার্য। সমাজে যেমন জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বিলাসের আয়োজন। ভোগের উপকরণ নিয়ে জীবনকে আমরা ভুলে আছি।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা শিবের দর্শন পেলাম। মনে হল, শিবের লিঙ্গরাজ নাম সার্থক হয়েছে। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি আগে কোথাও দেখি নি। মাটি থেকে এক বিঘৎ উঁচু, কিন্তু ব্যাস হবে পাঁচ হাতেরও বেশি। তারপর আমি দেবতার অন্য রূপ দেখলাম। এক পবিত্র আনন্দে মন আমার ভরে গেল। নত হয়ে দেবতাকে আমি প্রণাম করলাম। ঘন্টু ও পুপুও প্রণাম করল দু হাত জুড়ে।

একদা এই স্থানের নাম ছিল একাম্রকানন। অদ্ভুত সুন্দর স্থান। একদিন শিব পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাম্রকানন তাঁর বেশি প্রিয়। পার্বতীর ভারি কৌতূহল হল। তিনি গোপিনীর বেশে এই স্থান দেখতে এলেন। তাঁর রূপ দেখে কৃত্তি ও বাস নামে দুই দৈত্য মোহিত হল। এগিয়ে এসে তাঁকে

বিয়ে করতে চাইল। পার্বতী বললেন, বেশ, আগে আমাকে কাঁধে চড়াও।

দৈত্যদের মহাপুলক। দুজনে মিলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। আর যায় কোথায়! দেবীর ভারে তারা ছাতু হয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর পেল তৃষ্ণা। ততক্ষণে শিব উপস্থিত হয়েছেন। জলের জন্য তিনি যে সরোবর তৈরি করে দিলেন, তারই নাম বিন্দু সরোবর। শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে আহ্বান করে বললেন, এক এক বিন্দু করে জল দাও। সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে তাই সমস্ত তীর্থের জল। বিন্দু সরোবরে স্নান করলে সমস্ত তীর্থের পুণ্য।

পুপু এই গল্প শুনে বলল, 'বিন্দু সরোবর আমরা দেখবো না ছোটকা?'

আমি বললাম, 'দেখব বৈকি।'

মন্দিরের খুব কাছেই এই বিন্দু সরোবর। উত্তরের পথ ধরে বাজারের ভিতর দিয়ে বিন্দু সরোবরে পৌঁছতে হয়। বেশি দূর আমাদের হাঁটতে হল না। কয়েক পা এগিয়েই আমরা সরোবরের তীরে পৌঁছে গেলাম। বিশাল সরোবর। পূর্ব পারের বাঁধানো ঘাটে অনেকে স্নান করছে। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরও আমরা দেখতে পেলাম।

সেখান থেকে আমরা বাসের কাছে ফিরে এলাম। বাসের ভিতরে বসেই অনেকে খাচ্ছেন। যাঁদের সঙ্গে খাবার নেই, তাঁরা হোটেলে খেতে গেছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম।

পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'এবারে আমরা ফিরব নাকি ছোটকা?'

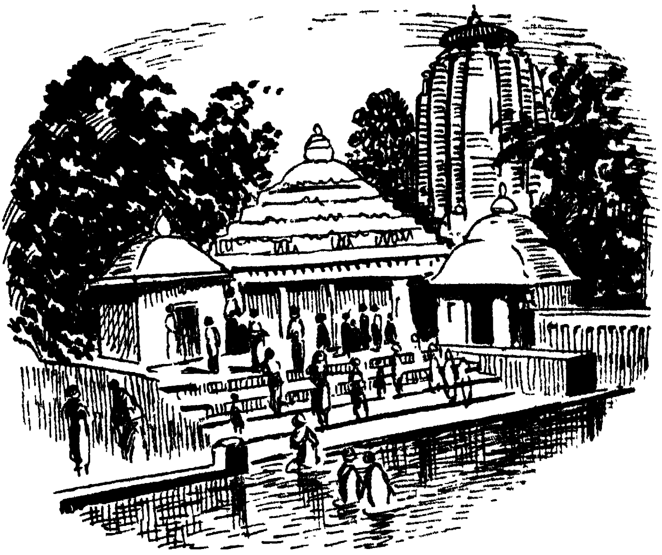
বললাম, 'না, এখনও অনেক মন্দির দেখতে বাকী আছে।'

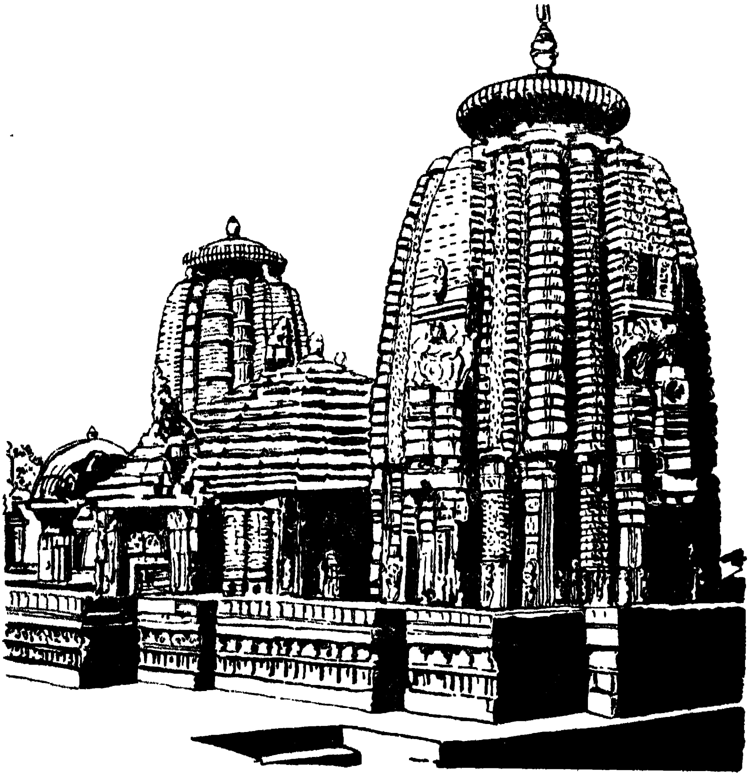
ঘণ্টু বলল, 'তারপর উদয়গিরি খণ্ডগিরি।'

সবাই ফিরে এলে বাস ছাড়ল।

প্রথমেই আমরা সিদ্ধারণ্যে এলাম। একদা এখানে একটি আমের বন ছিল। আর ছিল সুস্বাদু জলের প্রস্রবণ। তাই দেখে কয়েকজন সিদ্ধ এসে বসবাস শুরু করেন। পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, নদীও নেই। তবু এই মনোরম স্থান মন্দির নির্মাণের উপযোগী বলে রাজাদের মনে হল। একে একে অনেক মন্দির নির্মিত হল— মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর।

সিদ্ধারণ্যে আজ আমের বন নেই। কোন অরণ্যই নেই। শুধু প্রস্রবণ আছে— কেদার গৌরী আর গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড এখন একটি বাঁধানো সরোবর, ছেচাল্লিশ হাত লম্বা আর চওড়ায় বিশ হাতেরও কম। অনেক মেয়ে পুরুষ ঘাটে স্নান করছে। কেদার গৌরীর জলে যেমন নানা গুণ আছে, স্বাদও তেমনি সুন্দর।





মুক্তেশ্বর মন্দির

মুক্তেশ্বর মন্দিরকে একটি খেলার মন্দির বলে মনে হল। লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিশাল চূড়া তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। তাইতেই বোধ হয় এই মন্দিরকে এত ছোট মনে হচ্ছিল। বড় জোর হাত চব্বিশেক উঁচু।

তোরণটি সুন্দর। দুটি থামের উপর একটি অর্ধবৃত্ত। তার উপর সুন্দর কারুকার্য। এই তোরণের নিচ দিয়ে আমরা মন্দিরের ভিতরে গেলাম। দেবতার দর্শনের পর আমরা আরও অনেক কিছু দেখলাম—গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, আর কোলে শিশু নিয়ে সপ্ত মাতৃকা।

অষ্টম শতাব্দীর এই মন্দিরকে নাকি বালি পাথরের একটি স্বপ্ন বলা হয়। বলতেই হবে। প্রতি দিনের জীবনে তো এমন সুন্দর জিনিস আমরা দেখি না। দেখি স্বপ্নে। সুন্দরের বর্ণনা করতে তাই স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করি। সে যুগের স্থপতিরা কবি ছিল। কবির মতো স্বপ্ন দেখত। আর সেই স্বপ্নকে শাশ্বত রূপ দিত পাথরে। আজ আমরা পাথর দেখে তাদের স্বপ্নকে আবিষ্কার করছি।

একে একে আমরা কেদারেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দির দেখলাম। এগুলি নাকি লিঙ্গরাজ মন্দিরের চেয়েও প্রাচীন। সব চেয়ে প্রাচীন বলে পরিচিত পরশুরামেশ্বরের মন্দির। শুধু এর শিল্পরীতি দেখে নয়, একখানা শিলালিপি থেকেই এই কথা প্রমাণ হয়েছে। মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি বলে নবগ্রহ শিলায় উল্লেখ আছে।

অনেকে বলেন, কেদারেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সেইটেই সব চেয়ে প্রাচীন। এ কথার কোন প্রমাণ নেই। এই মন্দিরে আমরা দুর্গাকে দেখলাম, সিংহের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন অপরূপ মুখশ্রী আমি আর কোন মূর্তির দেখি নি।

পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের গায়ে সমস্ত রামায়ণখানা চিত্রিত হয়ে আছে। মহাভারতেরও চিত্র আছে। কিরাত ও অর্জুন, শিব ও পার্বতী। রাবণের কৈলাস উত্তোলনের দৃশ্যও আছে। পর্বতের নিচে রাবণ, উপরে হর পার্বতী। ইলোরার কৈলাস মন্দিরেও এই চিত্রটি আছে শুনেছি।

এই সব মন্দির দেখে বাসে আমরা ফিরে এলাম। সবাই উঠেছি কি না, পিছন ফিরে ড্রাইভার একবার তা দেখে নিল। তারপর রওনা হল উদয়গিরি খণ্ডগিরির দিকে।

রাজারাণী মন্দির আমরা ফেরার পথে দেখেছিলাম। সিদ্ধারণ্য

থেকে এই মন্দির খুব দূরে নয়। মাত্র ছশো হাত পূর্বে। তবু কেন পরে দেখলাম, সে কথা ড্রাইভারই জানে।

ভুবনেশ্বরে এই মন্দিরটিই নাকি সব চেয়ে সুন্দর। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ফার্গুসন সাহেব এই মন্দিরকে উড়িষ্যার শিল্পের একটি রত্ন বলেছেন। সত্যিই একটি রত্ন। ভিতরে আজ দেবতা নেই, প্রহরে প্রহরে পূজা হয় না এই মন্দিরে। তবু আসে অসংখ্য যাত্রী, সুন্দরের উপাসনায় আসে।

মন্দিরের নাম রাজারাণী কেন হল তা জানতে পেলাম। যে হলদে বালি-পাথরে এই মন্দির তৈরি, তারই নাম রাজরাণীয়া। এমন নাম সচরাচর দেখা যায় না। মন্দিরের নাম হয় দেবতার নামে। প্রতিষ্ঠাতার নামেও আজকাল দেবতার নাম হচ্ছে। পাথরের নামে মন্দিরের নাম এই প্রথম দেখলাম।

একজন যাত্রী বললেন যে রাজা উদ্যত কেশরী তাঁর মায়ের জন্য ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, আর এই মন্দিরটি রাজা রাণীর ইচ্ছাতে নির্মাণ করেন। সেই জন্যই এই মন্দিরের নাম রাজারাণী।

এত সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম বোধ হয় ভুবনেশ্বরে আর দেখি নি। লতা-পাতার যেমন সূক্ষ্ম কাজ, তেমনি মূর্তি। এক একটি অলস কন্যার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা কন্যা অলস ভাবে গাছে হেলান দিয়ে আছে। মাথার উপরে হাতের মুঠোয় এক থোকা পাতা। দেব দেবীর মূর্তিও অনেক আছে।

যত মন্দির আমরা দেখলাম, তার চেয়ে বেশি মন্দির আমাদের না দেখা রয়ে গেল। তীর্থেশ্বর কোটি তীর্থেশ্বর ব্রহ্মেশ্বর ভাস্করেশ্বর মেঘেশ্বর অলাবুকেশ্বর উত্তরেশ্বর সোমেশ্বর আরও কত শত ঈশ্বর। দর্শন এখানে সংক্ষেপ করতেই হবে। ত্রিভুবনেশ্বর যে নিজেই এখানে সংক্ষেপে ভুবনেশ্বর হয়েছেন।



উদয়গিরি

ভুবনেশ্বরের রাজধানী এলাকাটি যেন নূতন একটি শহর। পুরনো শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এখন এই রকম হচ্ছে। শুধু রাজধানীর প্রয়োজনে নয়, বাসস্থানের প্রয়োজনেও। এ সমস্ত শহর মন্দ দেখায় না। এক ধারে পুরাতন ঘিঞ্জি বস্তি ধোঁয়ায় ও ধুলায় মলিন, অন্য ধারে প্রশস্ত রাজপথের দু পাশে একই রকমের সৌধশ্রেণী। বিশ্বকর্মা যেন রাতারাতি একটি নগর নির্মাণ করেছেন।

এক সময় শহর শেষ হয়ে গেল। আমরা অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দু পাশের গাছ ক্রমে গভীর হবে, পথ উঠবে উপরের দিকে। পর্বতের পাদদেশে এসে আমাদের বাস স্থির হবে। তাই হল। নূতন রাজধানী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গাছের ছায়ায় এসে আমাদের বাস দাঁড়াল। বামে খণ্ডগিরি দক্ষিণে উদয়গিরি। উদয়গিরির উচ্চতা

তত বেশি নয়। একশো ফুটের কিছু বেশি হতে পারে। অপর প্রান্তে খণ্ডগিরি খাড়া উঠেছে। যাত্রীরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। আমরা গেলাম উদয়গিরির দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠেই স্বর্গপুরী গুহা। উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকর্ম নেই, কিছু তরুলতা ও একটি হাতিকে বড় জীবন্ত মনে হল।

খানিকটা এগিয়ে রাণী গুম্ফা। রাণীকা নৌর মানে রাণীর প্রাসাদ। এটি দোতলা বাড়ি। জানা গেল যে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জৈন রাজা খরবেলা তাঁর রাণীর জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। দেওয়ালে কিছু কারুকার্য আছে। এক স্থানে রাজারাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পের নমুনা কোথাও নেই।

পাহাড়ের উপরে অনেকটা উঠে গণেশ গুম্ফা। দুটি ঘর ও একটি বারান্দাওয়ালা একতলা গুহা। স্তম্ভের গায়ে অসংখ্য নারী মূর্তি আর সিঁড়ির ধাপে নতজানু হাতি। দেওয়ালেও বিচিত্র কারুকার্য। এই উন্নতি দেখে গুহাটিকে রাণী গুম্ফার পরবর্তী কালের বলে মনে হবে।

জয়বিজয় গুহার মাঝখানে একটি বোধিবৃক্ষ আছে, আর একটি গুহার নাম বৈকুণ্ঠ গুহা। এ সব সমসাময়িক।

হাতি গুহায় একটি অবিস্মরণীয় শিলালিপি আছে। রাজা খরবেলার জীবন চরিত। মাত্র পনর বৎসর বয়সে খরবেলা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন—অর্থ ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিত্তায় পারদর্শী হয়েছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে যুবরাজ ও তার কিছু পরেই রাজা হন। রাজত্ব লাভের পরেই তিনি রাজ্য জয়ে বাহির হন। উত্তর পশ্চিম ও সুদূর দক্ষিণে তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তাই তাঁর বেশি ছিল। তাই রাজ্য জয়ের চেয়ে প্রজার উপকার তিনি বেশি করেছিলেন।

তিনশো বছর আগে যে সব খাল কাটা হয়েছিল, সেগুলোর তিনি উন্নতি সাধন করেন। প্রচুর জলাশয় খনন করেন। উদ্যানও প্রতিষ্ঠা করেন অনেক। রাজা খরবেলার তেরো বৎসরের রাজত্ব কাহিনী এই শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের কোন ঘটনা জানা যায় না। জানবার উপায়ও নেই।

খরবেলার কাল খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে। ভারতে তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার হচ্ছে। চীনা পরিব্রাজক হিউএন চাং এখানে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুষ্পগিরি নামে সংঘারামের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন যে এই সংঘারামটি উদয়গিরির উপরে কিংবা নিকটেই কোনখানে ছিল। খরবেলা জৈন রাজা ছিলেন, কিন্তু এই গুহাগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরও বাস ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে বৌদ্ধ শ্রমণেরা এখানে আসতেন। বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হত এই সব সংঘারামে। তারপর যুগের পরিবর্তন হল। পরিত্যক্ত হল এইসব নির্জন গুহা। মানুষের বাসস্থান হল বন্য শ্বাপদের আবাস। এখন অরণ্যে অগ্রসর হতে গা ছমছম করে। যে পথে আমরা এগোচ্ছিলাম, সেই পথ ধরেই বনের ভিতর দিয়ে খণ্ডগিরি পৌঁছনো যায়। পথের ধারে সব শুদ্ধ গোটা তিরিশেক গুহা আছে। ইচ্ছা করলে খণ্ডগিরি পাহাড় দেখে নিচে নামা যায়। কিন্তু আমাদের সে সাহস হল না। শুধু বনের ভয় নয়, সময়েরও ভাবনা ছিল। আমরা তাই পুরনো পথেই ফিরে এলাম।

রাস্তার পরপারে খণ্ডগিরি। পাহাড়ে উঠবার জন্য উঁচু উঁচু ধাপ। মহিলাদের উঠতে কষ্ট হয়। যাঁদের বয়স বেশি, তাঁরা থেমে থেমে ওঠেন। ঘণ্টু ও পুপু উঠছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। আমি পিছনে ছিলাম।

ঘণ্টু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দিকে একটা গুহা ছোটকা।'

পুপুও দাঁড়িয়ে বলল, 'কোন্ দিকে দাদা?'

আমি পৌঁছবার আগেই এক ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসেছিলেন ছোট একটি তামার ঘটি হাতে। কুশীতে করে একটু একটু চরণামৃত তাদের হাতে ঢেলে দিয়েছিলেন। তারা হাত পেতে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তখন পৌঁছে গিয়েছি। কোন্ দেবতার চরণামৃত তা জানা হল না, আচম্বিতে আমার হাতেও পড়ল। এবং সংস্কারের বশেই সেই জলটুকু পান করলাম। ঘণ্টু ও পুপু এই চরণামৃত পান করল আমার পরে।

তারপরেই ব্রাহ্মণ আমাদের গুহার ভিতর টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'এই গুহার নাম অনন্ত গুহা।'

তারপর দেখালেন অনেক দেবদেবী। তেল সিঁদুর দিয়ে লেপা, কিছু ফুলও আছে। কয়েকটি পয়সা পেতেই ব্রাহ্মণ আমাদের মুক্তি দিয়েই অন্য যাত্রী ধরলেন। আমরা আবার উপরে উঠতে লাগলাম।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'ক তলার সমান উঁচু হবে দাদা?'

ঘণ্টু এই প্রশ্ন শুনে খুশি হল, মুরুব্বির মতো বলল, 'পাঁচ ছ তলার বেশি হবে না।'

খণ্ডগিরির উচ্চতা আমার জানা নেই বলে আমি কোন কথা বললাম না।

এই জায়গাটি আমাদের ভাল লাগল। অনেকটা খোলা জায়গা নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে পার্শ্বনাথের মন্দির। মন্দির দেখবার আগে আমরা দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে নিচে ভুবনেশ্বরের অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। যেন উড়ো জাহাজ থেকে আমরা এই দৃশ্য দেখছি।

প্রথমেই উদয় গিরি পাহাড়। চোখের সামনে স্বর্গপুরী গুহা। অন্য গুহাগুলি পাহাড়ের অন্য ধারে। এখান থেকে দেখা যায় না।

তারপর বিস্তৃত প্রান্তর। দূরে নূতন রাজধানীর পিছনে অগণিত মন্দির দেখা যাচ্ছে। সব চেয়ে উঁচু মন্দিরটি যে লিঙ্গরাজের তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরে আমরা পার্শ্বনাথের মন্দির দেখলাম। পার্শ্বনাথ জৈন তীর্থঙ্কর। অনেকে বলেন পরেশনাথ। বিহারে পরেশনাথ পাহাড়ের উপরেও আছে পার্শ্বনাথের মন্দির।

পুপু খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কত বড় হনুমান দেখ দাদা!'

সত্যি হনুমান দেখলে যে পুপু ভয়ে পিছিয়ে আসত, আমি তা জানি। পুপুর সাহস দেখেই ঘণ্টু এগিয়ে গেল। বলল, 'মন্দিরের ভেতর হনুমান কেন ছোটকা?'

হেসে বললাম, 'হনুমান নয়, মহাবীর। প্রণাম কর মহাবীরকে

দু জনে দু হাত জুড়ে মহাবীরের বিরাট মূর্তিকে প্রণাম করল।

ভুবনেশ্বরে ফেরার পথে আমরা ধৌলি দেখলাম। বাস থেকে নেমে কাছে গিয়ে দেখি নি, দেখলাম দূর থেকে। স্থানীয় এক যাত্রীর মুখে ধৌলির গল্প শুনলাম।

ভুবনেশ্বর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে একটা নিচু পাহাড়ের নাম ধৌলি। একখানা বড় পাথরের গায়ে অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ করা আছে। একটা বিরাট হাতীর মূর্তিও উৎকীর্ণ আছে।

ঘণ্টুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা মনে আছে?'

ঘণ্টু বলল, 'খুব বড় যুদ্ধ।'

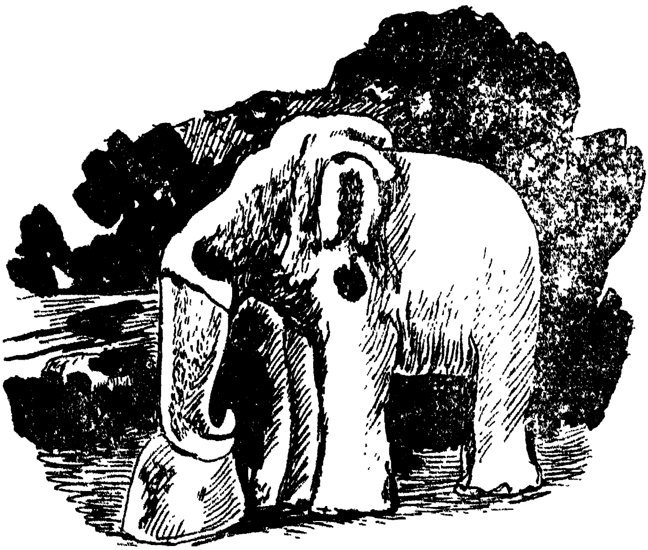
পুপু বলল, 'কত বড় ছোটকা?'

হেসে বললাম, 'কুরুক্ষেত্রের মতো অত বড় নয়। তবু এক লক্ষ লোক মরেছে, আর বন্দী হয়েছে দু লক্ষ। তারপর যুদ্ধের পরে

কত লোক অনাহারে ও রোগে মরেছে, তার কোন হিসেব নেই। লোকে কয়েক লক্ষ বলে।'

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই শো বছর আগের ঘটনা। সম্রাট অশোক দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখলেন। তারপর ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের কান্না দেখলেন, আর অসহায় মায়ের কান্না। সম্রাট নিজে এই দৃশ্য দেখে কাঁদলেন। তারপর তরোয়াল ফেলে দিয়ে বললেন, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। নিজে বৌদ্ধ হয়ে অশোক দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে মন দিলেন। ধৌলির শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করলেন তাঁর অনুশাসন।

এই শিলালিপির পাশ দিয়ে এখন বোধহয় আর কোন ভাল রাজপথ নেই। তাই আমরা ভুবনেশ্বরে গেলাম অন্য পথ দিয়ে।





শ্রীগৌরাঙ্গ

এক ভদ্রলোকের কাছে উড়িষ্যার অনেক কথা জানতে পেলাম। মাদলা পঞ্জী নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থে উড়িষ্যার রাজাদের ইতিহাস আছে। দ্বাপর যুগে উৎকল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়ও এখানে রাজত্ব করেছেন তারপর আঠারো জন রাজার পরে যবনরা উৎকল অধিকার করে। এই যবন মানে মুসলমান নয়। গ্রীক ও বৌদ্ধরাও এ দেশে যবন নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের তিন চার শো বছর আগে থেকে ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যবনদের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর

যযাতি কেশরী নামে এক হিন্দু রাজা এই রাজ্য উদ্ধার করে ভুবনেশ্বরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

এঁর বংশের চুয়াল্লিশ জন রাজা প্রায় সাতশো বছর রাজত্ব করেন। এঁরা সকলেই শৈব ছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে অগণিত শিবের মন্দির নির্মাণ করে তাঁদের রাজধানীকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দির নগরে পরিণত করে যান।

এই বংশেরই রাজা নৃপ কেশরী কটক শহর পত্তন করেন। এবং অপুত্রক রাজা সুবর্ণ কেশরী ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। দেশে এই সময় প্রবল অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে চোড়গঙ্গ নামে একজন বাঙ্গালী উৎকল রাজ্য অধিকার করেন।

চোড়গঙ্গের দেশ তাম্রলিপ্তি বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। তাম্রলিপ্তির নতুন নাম তমলুক। তমলুক বাঙ্গলা দেশের মেদিনীপুর জেলায়। এই চোড়গঙ্গ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তিনি বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গলা দেশ থেকে উড়িষ্যায় নিয়ে আসেন। এই বংশেরই পঞ্চম-রাজা অনঙ্গভীম দেব পুরীতে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করেন।

বীরত্বে গঙ্গ বংশের খ্যাতি আছে। চোড়গঙ্গ উৎকল রাজ্য অধিকার করেন, আর তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর অধিকার করেন গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজ্য জয় করেন, আর সেতুবন্ধ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিজের শাসনে আনেন কপিল রাজা। চার শো বছর ধরে এই বংশের তেইশ জন রাজা সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন।

১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে এক ব্যক্তি রাজা হন। ইনি এবং এঁর পর চারজন রাজা পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন প্রথম মুকুন্দ দেব। হিন্দু বিদ্বেষী কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় সর্বত্র যা করেছিলেন, উড়িষ্যাতেও তাই

করলেন। পুরীর মন্দির লুণ্ঠন করে দেবমূর্তি ধ্বংস করলেন। এর পরেও হিন্দু রাজারা অনেক দিন রাজত্ব করেছিলেন। উড়িষ্যা কিছু দিন রাজপুতের অধিকারে ছিল। আকবরের আমলে ছিল পাঠানের কবলে। শাহজাহান এ রাজ্য দখল করেন। পাঠান ও মোগল অত্যাচারের পর যা বাকি ছিল, তা শুষে নিয়ে গেল মারাঠা বর্গীর দল। বাঙলার নবাব সিরাজকে পরাজিত করে ইংরেজ উড়িষ্যা অধিকার করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর।

শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্যের কথাও শুনলাম। সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম বাঙ্গালী লেখকের ওড়িয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার কথা জেনে। আমাদের অন্নদাশঙ্কর রায় যে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন, তা আমার জানা ছিল। এবারে শুনলাম যে আধুনিক ওড়িয়া ভাষায় কবি সম্রাট নামে যিনি পরিচিত, তিনি একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম রাধানাথ রায়। তিনি মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখেছেন। শোনা যায় যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তঁাকে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছেন। আর তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছেন নবীনচন্দ্র সেন।

ওড়িয়া ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্যের জন্য বাঙ্গালীর কাছে বিজাতীয় মনে হয় না। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে অনেক কথা বোঝাও সম্ভব। শব্দের শেষে হসন্তের অভাবটাই কানে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা নটবর উচ্চারণ করি নটবর্, আর উড়িষ্যার লোকেরা বলে নটবর, রঅ-। এই উচ্চারণ কানে অভ্যস্ত হতে একেবারেই সময় লাগে না। মনে হয়, কিছু দিন চেষ্টা করলেই ওড়িয়া ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলা অসম্ভব নয়।

সাহিত্যেব কথার চেয়ে আমাদের উড়িষ্যার মানুষের কথা বেশি ভাল লাগল। শুনলাম যে উড়িষ্যায় আদিবাসীর সংখ্যা হল শত-

করা ছেষট্টি জন। বাকি চৌত্রিশ জন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতি। বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণের মতো উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরাও এসেছে কনৌজ থেকে। প্রায় এক হাজার বছর আগে এক রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য দলে দলে ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। এক সম্বলপুরেই ব্রাহ্মণ আছে ছয় শ্রেণীর। কনৌজ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণও আছে।

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, আরও অনেক জাতের মানুষ এসেছে রাজাদের নিমন্ত্রণে। চাষী ও তাঁতিরা এসেছে আগ্রা ও দিল্লী থেকে। উড়িষ্যা একদা শান্তির দেশ ছিল, আর রাজারা নানা শিল্পকার্যে উৎসাহ দিতেন। বিদেশ থেকে তাই সবাই চলে আসত।

উড়িষ্যাবাসীদের দুটো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথম হল, আইনকে এরা খুব ভক্তি করে। নিজেদের ঝগড়া ঝাঁটি নিজেরাই মিটিয়ে নেয়, আদালতে মামলা করতে যায় না। আদিবাসীরা তো গ্রামের পঞ্চায়েতের উপর আর কিছু আছে বলেই জানে না। আইন আদালত শুধু শিক্ষিত সমাজের জন্য। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা নিতান্তই কম।

এদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল জাতিভেদ প্রথা। জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণ দেখেই বোঝা যায় যে জাতের বালাই নেই। খাওয়া ছোঁয়াব ব্যাপারে কারও জাত যায় না। বরং নিজের গুণে এরা জাতে ওঠে। বিদ্যার্জন করে অনেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, আর ক্ষত্রিয় হয়েছে শক্তি অর্জন করে। এ শুধু জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য নয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাব বলে আমার মনে হয়। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান চৈতন্যদেবের ছিল না। সকল মানুষকেই তিনি এক জাতের ভাবতেন। আর এই ধর্মই তিনি সারা জীবন প্রচার করে গেছেন; প্রচার করেছেন পুরীতে, বাঙলায় নয়, ভারতের আর কোন তীর্থস্থানেও নয়। এই কথা ভাবলে প্রথমে একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি।

ঘণ্টু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'চৈতন্যদেব তো বাঙালী। বাঙলায় কেন তাঁর মত প্রচার করেন নি ?'

বললাম, 'মায়ের জন্যে। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মায়ের অনুমতি না পেলে সন্ন্যাস নেওয়া যায় না। তাই তিনি মায়ের পা ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র ছেলে, তাকে কি সন্ন্যাসী হতে দেওয়া যায়! কিন্তু নিমাই নাছোড়বান্দা। বলেছিলেন, তোমার কান্না আমি চোখ দিয়ে দেখছি মা, কিন্তু মন দিয়ে শুনি পৃথিবীর মানুষের কান্না। সকলের চোখের জল আমাকে মোছাতে দাও। শচীমা কাঁদতে কাঁদতেই সম্মতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে চোখের আড়াল করে কি বাঁচব! তোমার খবর যদি নিয়মিত না পাই!'

পুপু বলল, 'সন্ন্যাসী হলে বুঝি ঘরে থাকা যায় না ?'

'না, তীর্থস্থানে থাকতে হয়। না হয় এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে ঘুরে বেড়াতে হয়। শচীমা বললেন, তুমি বেশি দূরে যেও না, আর সঙ্গে রেখ তোমার সঙ্গীদের। নিমাই পণ্ডিত বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শচীমা বললেন, না, সে বড় দূর, সেখান থেকে কোন খবরই পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে নীলাচল পুরীতে থাক। নবদ্বীপের লোক সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। সন্ন্যাস নিয়ে নিমাই পণ্ডিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর মায়ের কথায় সারা জীবন কাটালেন নীলাচল পুরীতে।'

ঘণ্টু শুনতে না পায়, এমনি আস্তে আস্তে পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'নিমাই পণ্ডিত কে ছোটকা ?'

হেসে বললাম, 'গৌরাঙ্গ দেবের নাম শোন নি ?'

ঘণ্টু শুনতে পেয়েছিল, বলল, 'কোথা থেকে শুনবে, ওদের স্কুলের সিস্টাররাই হয়তো শোনে নি।'

বলে গর্বিত ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'না না, তা নয়। বড় হলে ওরাও পড়বে।'

এই বড় হবার কথায় বোধহয় পুপু আরও আহত হল, বলল, 'সবাই কি সব জিনিস পড়ে না'কি !'

আমি গম্ভীর ভাবে সে কথা মেনে নিলাম, বললাম, 'ঠিকই তো।'

তারপরে তাকে চৈতন্য দেবের কথা শোনালাম।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইএর জন্ম হয়েছিল দোল পূর্ণিমার দিন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র তাঁর বাবা, মায়ের নাম শচীদেবী। মুসলমানের অত্যাচারে বাঙ্গলা দেশে তখন দুর্দশার সীমা নেই। নিমাই বড় হয়ে দেশের লোকের দুঃখের কথা জানলেন। শৈশবে তিনি বড় চঞ্চল ছিলেন, যৌবনে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করে অহংকারে উদ্ধত হলেন। কিন্তু সহসা তাঁর জীবনে পরিবর্তন এল। তিনি পিতার পিণ্ডদান করতে গয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে সম্মোহিত হয়ে গেলেন। তারপর ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন। সকল মহাপুরুষের যেমন জীবের দুঃখ দেখে হৃদয় বিগলিত হয়, নিমাইএরও তাই হল। নিমাই সকলের জন্য কেঁদে সংসার ত্যাগ করলেন, আর নিমাইএর জন্য কাঁদলেন শচীমাতা, কাঁদলেন তাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, আর কাঁদলেন তাঁর সঙ্গী নিত্যানন্দ ও অগণিত ভক্তবৃন্দ।

পুপুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীর্তন শুনেছ ?'

ঘন্টু বলল, 'শুনেছি ছোটকা, কীর্তনের পরে হরিলুট হয়।'

আমি হেসে বললাম, 'চৈতন্যদেব কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতেন, আর তার সঙ্গী নিত্যানন্দ গাইতেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

চৈতন্য দেবেরই নাম গৌরাঙ্গ। নবদ্বীপে আজও তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামে পূজিত।'

ঘণ্টু বলল, 'গম্ভীরায় আমরা এঁরই স্মৃতি চিহ্ন দেখেছি, তাই না ছোটকা ?'

বললাম, 'ঠিক তাই। এ দেশের ভাষায় ছোট কুঠরিকে বলে গম্ভীরা। মহাপ্রভু ঐ কুঠরিতে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন।'

তারপর সে গল্পও তাদের বললাম।

বাঙ্গলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ হচ্ছিল। সীমান্তে উভয় দেশের সৈন্য পাহারায় রত। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ থেকে পুরীতে আসছিলেন, তখন রাজা রামচন্দ্র খাঁর সৈন্যরা তাঁকে বাধা দিয়েছিল। পরে রাজা এই নির্ভীক তরুণ সন্ন্যাসীকে নৌকোয় করে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিলেন।

ভাবে বিভোর হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে পৌঁছলেন, তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে ভোগের আয়োজন হচ্ছিল। নাট মন্দিরের দেওয়ালে হাত রেখে তিনি ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। আজও সেই দেওয়ালে তাঁর আঙুলের ছাপ আছে।

পুপু বলে উঠল, 'কই আমরা সেই ছাপ দেখি নি তো।'

ঘণ্টুও আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, 'দেখতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।'

পুপু বলল, 'আর একবার গিয়ে আমরা দেখে আসব।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

ঘণ্টু বলল, 'তারপর কী হল ছোটকা ?'

বললাম, 'জগন্নাথ দর্শনের জন্যে মহাপ্রভু এমন অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে আর ধৈর্য ধরতে পারেন নি। সকলের নিষেধ অমান্য করে তিনি দেবতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, এ কী হল! দেবতার ভোগ অপবিত্র হয়ে গেল, দেবতা হলেন অশুচি। অচেতন মহাপ্রভুকে তাঁরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।'

ঘণ্টু বলে উঠল, 'কে বাঁচালেন তাঁকে ?'

হেসে বললাম, 'রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে রক্ষা করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন।'

পুপু বলল, 'কেন ?'

'এই পাগল সন্ন্যাসীকে তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই এই মানুষটি এমন পাগলের মতো নাচে আর গায়। নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে মহাপ্রভু তাঁর এক বন্ধুর পুত্র। তাই স্থির করলেন যে তাঁকে বেদান্ত দর্শন পড়াবেন। বেদান্তের জ্ঞান হলেই তাঁর পাগলামি দূর হবে।

বাসুদেব সার্বভৌম একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, বেদান্ত দর্শনে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে মহাপ্রভুকেও পড়াতে লাগলেন। নিতান্ত ভাল ছেলের মতো মহাপ্রভু পড়তে লাগলেন। সাত আট দিন কেটে গেল, কিন্তু মহাপ্রভুর মুখ দেখে গুরু বুঝতে পারলেন না তিনি কিছু বুঝতে পারছেন কি না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন প্রশ্ন করছ না যে ?

মহাপ্রভু সবিনয়ে বললেন, কী প্রশ্ন করব! আপনি যে বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

গুরু চমকে উঠলেন। রাগে অন্ধ হয়ে বললেন, আমি ভুল ব্যাখ্যা করছি!

ধীর শান্ত কণ্ঠে মহাপ্রভু বললেন, বিদ্যার অহংকার ত্যাগ করলেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

তারপর মহাপ্রভু একটি একটি করে শ্লোক আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করলেন।

সার্বভৌম বুঝতে পারলেন যে পুঁথির পাতায় আর বুদ্ধির বিচারে নেই ভগবান, ভগবান নেই বিদ্যার দম্ভে, কিংবা আচারের প্রাচীরে বদ্ধ। ভগবান ভক্তের, ভগবান প্রেমের, ভগবান আছেন

আত্মনিবেদনের আনন্দে। তারপর তিনি নিজের ঘরের দুয়ার সকলের জন্য খুলে দিলেন, আর নিত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলেন—

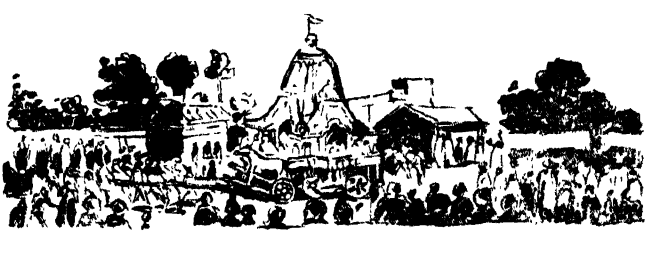
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

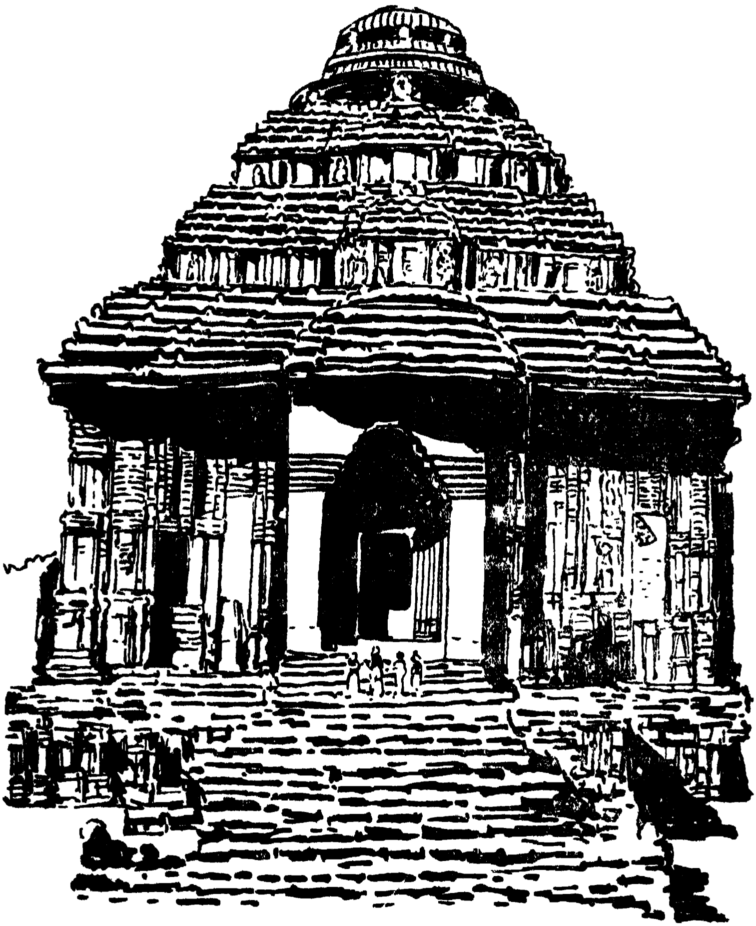
নীলাচলের দরিদ্র অনাদৃত অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে এল নূতন চেতনা। দেশের রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু মহাপ্রভু রাজী হলেন না। শেষে রথযাত্রার দিন মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন। জগন্নাথের রথ চলেছে, সঙ্গে চলেছেন সচল জগন্নাথ। রাজা তাঁর রাজবেশে যখন তাঁর কাছে এলেন, তখন তিনি তাঁকে দূরে ঠেলে দিলেন। তারপর রাজা আবার তাঁর কাছে এলেন সাধারণ মানুষের মতো দরিদ্র বেশে। মহাপ্রভু তখন তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, এই তো আমার রাজা।

মহাপ্রভুর মৃত্যুর কথা কেউ জানে না। একবার নবদ্বীপ থেকে পুরীতে ফিরে এসে মহাপ্রভু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। স্থির গম্ভীর ভাবে বিভোর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। ভক্তরা গোবিন্দকে তাঁর পাহারার জন্য নিযুক্ত করল।

তবু এক দিন রাত্রে তিনি হারিয়ে গেলেন। খুঁজে খুঁজে তাঁকে জেলেদের জালে পাওয়া গেল। শেষ রাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে তারা মহাপ্রভুকে জালে পেয়েছে।

এমনি ঘটনা আরও এক দিন ঘটল, কিন্তু সেদিন আর তাঁকে পাওয়া গেল না।'





কোনারকের মন্দির

যেমন করে আমরা ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি করেই আমরা কোনারক যাত্রা করলাম। পুপু উঠেছিল সাত সকালে, ঘণ্টুকে জাগিয়ে বলেছিল, 'এখানে কি মা আছেন নাকি যে রোজ তোমাকে ডেকে দেবেন!'

ঘণ্টু ধড়মড় করে উঠে বলেছিল, 'কেন, বাস এসেছে নাকি?'

পুপু বলল, 'চুপ, ছোটকার ঘুম ভেঙে যাবে!'

ঘণ্টু নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসল। আমি যে জেগে ছিলাম, সে কথা ওদের জানতে দিই নি।

সকাল সাতটাতেই বাস এসেছিল। আমরা চা খেয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বাসে উঠেছিলাম। হোটেলের ঠাকুরের রান্না তখনও শেষ হয় নি। ম্যানেজার বকাবকি করে কোন রকমে টিফিন কেরিয়ারগুলো তুলে দিলেন। বাস ছাড়তে খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

তারপর আরও দুটো হোটেল থেকে যাত্রী তোলা হল। একজন যাত্রী কোন রকমে বসলেন, আর একজনের জায়গাই হল না। আমার মনে হল, ছোট ছেলেমেয়েদের তারা হিসাব করে নি, অথচ বসবার জন্যে তাদেরও জায়গা দরকার। অর্ধেক ভাড়া কিন্তু ঠিকই নিয়েছে।

প্রথমে খানিকক্ষণ বিবাদ হল। কোন ভদ্রলোক যাবেন না বলে যাচ্ছেন, তাই নিয়ে বিবাদ। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা একটা করতেই হল। হোটেল থেকে একটা মোড়া এনে একজন তারই উপরে বসলেন। তারপরে সমুদ্রের ধার থেকে বাস পুরী শহরের ভিতর দিয়ে ভুবনেশ্বরের রাস্তায় এসে পৌঁছল।

সেই পুরনো প্রশস্ত পথ, আমরা এই পথে ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম। এবারে আর সাক্ষী গোপাল নয়, এবারে সোজা রাস্তায় সেই পিপ্‌লি। পিপ্‌লি থেকেই আর একটা পথ কোনারকের দিকে গেছে।

এক সময় পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'কোনারকে আমরা কী দেখব ছোটকা?'

উত্তর ঘণ্টু দিল, বলল, 'সূর্যের মন্দির।'

পুপু বলল, 'সূর্য কি ঠাকুর নাকি?'

প্রশ্নটা বোধহয় ঘণ্টুকেই করেছিল, কিন্তু সে এ কথার

উত্তর দিতে পারল না। করুণ চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বাসের এক যাত্রী বললেন, 'সূর্য দেবতা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সূর্যের মন্দির কোথাও দেখি নি।'

আর একজন বললেন, 'সূর্য পূজার প্রচলনও দেশ থেকে উঠে গেছে।'

প্রাগৈতিহাসিক যুগে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল। পার্সীরা বোধহয় সূর্য উপাসক। ভারতবর্ষে সূর্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কয়েকটি আছে বলে শুনেছি। কাশ্মীরে মার্তণ্ড মন্দির, আমেদাবাদের কাছে মধেরায় ও প্রভাসে সূর্য মন্দির আছে, কিন্তু কোন মূর্তি নেই। কোনারকের মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে, সূর্যের মূর্তি আর নেই। কিন্তু দেশ থেকে সূর্য পূজা একেবারে উঠে গেছে বলে মনে হয় না। বিহারে ও উত্তর প্রদেশে যে ছট্ পূজা দেখি, সে বোধ হয় সূর্যেরই পূজা। মেয়ে পুরুষ সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে নদী বা সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যেরই বন্দনা করে। কিন্তু পুপুকে আমি অন্য কথা বললাম, 'দেবতাদের রাজা ইন্দ্রেরও কোন মন্দির নেই, তবু তিনি দেবতাদের রাজা।'

তারপর আলোচনা হল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। কৃষ্ণের শাপে তাঁর পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। চিকিৎসার জন্যে শাম্ব দ্বারকা থেকে উড়িষ্যায় এসেছিলেন। চন্দ্রভাগা যেখানে সমুদ্রে মিলেছে, তারই কাছে মৈত্রেয় বন। সেই বনে কঠোর তপস্যা করে সূর্যের কৃপায় তাঁর রোগমুক্তি হয়। তারপরে যখন চন্দ্রভাগায় স্নান করছেন, তখন নদীর বালির উপর একটি সুন্দর মূর্তি দেখতে পেলেন। মূর্তিটি সূর্যের। শাম্ব একটি মন্দির তৈরি করে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন, আর এই অঞ্চলে সূর্যের পূজার প্রচলন করে গেলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, কোনারকেই শাম্ব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা এইখানেই ছিল চন্দ্রভাগা নদী ও মৈত্রেয় বন।

এই গল্প পুরাণের। কিন্তু এতে একটি সত্য কথা বলা হয়েছে। সূর্যের রশ্মিতে যে রোগ নিরাময় হতে পারে, দ্বাপরের মানুষ তা জানতেন। আর জানতেন বলেই শাম্বকে প্রভাত সূর্যের উপাসনা করতে বলা হয়েছিল। এ যুগের মানুষ সূর্যের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন না, চিকিৎসার জন্য সোলেরিয়াম স্থাপন করেন।

আমরা কোনারকের যে মন্দির দেখতে যাচ্ছি, তা রাজা প্রথম নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মাণ করেন। গঙ্গাবংশের এই রাজার শাসনকাল ছিল গৌরবময়। সমগ্র উত্তর পশ্চিম ও বাঙ্গলা দেশ যখন মুসলমান শক্তির পদানত হচ্ছিল একে একে, তখন উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব তাঁর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা হেরে গিয়ে পালিয়ে যায়। তার ফলে আরও দুশো বছর উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। লোকে বলে, কোনারকের সূর্য মন্দির রাজা নরসিংহদেবের জয়স্তম্ভ। বারো শো কারিগর বারো বছর ধরে এই মন্দির তৈরি করেছে। রাজ্যের বারো বছরের আয় খরচ হয়েছে এই মন্দির নির্মাণে।

আমাদের পথের দুধারে বড় বড় প্রান্তর আর ছোট ছোট গ্রাম, সেই সব পেরিয়ে আমরা পিপ্‌লির বাজারে এসে পৌঁছলাম। জনবহুল লোকালয়। ডান হাতে মোড় নিয়ে বাস কয়েকটা ফলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার নামল, কয়েকজন যাত্রীও নামলেন। বাস কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়াবে শুনে আমরাও নামলাম।

ঘণ্টু বলল, 'কী সুন্দর কলা দেখেছ ছোটকা!'

আমি পুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এ কলায় বোধ হয় বীচি হয়।'

পুপু তখনই আপত্তি জানাল, 'না ছোটকা, এ কলায় বীচি হয় না।'

বললাম, 'সত্যি নাকি!'

ততক্ষণে গোটাকয়েক কলা ঘণ্টুর হাতে এসে গেছে। আমি পকেটে হাত দিতেই সেই কলা ভাগাভাগি হয়ে গেল। পুপু বলল, 'সব খেও না দাদা, ছোটকাকেও দিও।'

পুরী থেকে কোনারক একচল্লিশ মাইল পথ, ভুবনেশ্বর থেকে বারো মাইল বেশি। পিপ্‌লি তাই ঠিক মাঝপথে নয়, পুরী থেকেই কাছে। এই পিপ্‌লি থেকেই কোনারকে যাবার সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়েছে। অনেক দিন আগে যখন এই রাস্তা ছিল না, তখন পুরী থেকে পায়ে হেঁটে সমুদ্রের ধারে ধারে কোনারকে যেতে হত, কিংবা গরুর গাড়িতে করে। পথ হত একুশ মাইল, কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগত। রাতে খেয়ে দেয়ে গরুর গাড়িতে উঠে ঘুমলে ভোর বেলায় কোনারক পৌঁছনো যেত। পুরনো ভ্রমণ কাহিনীতে এই সব গল্প পড়েছি।

অল্পক্ষণ পরেই আমাদের বাস ছাড়ল। মাঠ ছাড়িয়ে গ্রাম পেরিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। যেখানে গ্রাম, সেখানে পথ খুব সংকীর্ণ। দু পাশে কুঁড়ে ঘর। কোনটি মাটির, কোনটি ইঁট বা পাথরের। মাটি লেপা দেওয়ালে সাদা আল্পনা আঁকা, উপরে খড়ের চাল। দূরে দূরে খেজুর আর নারকেল গাছ দেখছি। গরুর গাড়ি চলতেও দেখছি। বাঙ্গলা দেশের মতো ছোট চাকার গাড়ি নয়। বড় বড় চাকা। এই সব গাড়িতে নাকি ভারি জিনিস বইতে সুবিধে।

কোনারক মন্দিরের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে।

যে বারো শো শিল্পী মন্দির নির্মাণ করে, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বিষ্ণু মহারাণা। বিষ্ণু মহারাণার ছেলের নাম ধর্মপদ। ধর্মপদর জন্মের পরেই সে তার বউ ও ছেলেকে বাড়িতে রেখে কোনারকের মন্দির তৈরি করতে আসে। বছরের পর বছর কাজ করে, বাড়ি ফেরার কথা আর মনে থাকে না। এদিকে ধর্মপদ বড়

হচ্ছে। তার মা তাকে স্থপতির কাজ শিখিয়েছে যত্ন করে। একদিন সে তার বাপকে খুঁজতে বেরল। খুঁজতে খুঁজতে কোনারকে এসে দেখল যে তার বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। হিসাবের একটা ভুল হয়ে গেছে. তাই মন্দিরের চূড়ো আর শেষ হচ্ছে না। তার বারো শো কারিগরও হাত গুটিয়ে বসে আছে। রাজাও এই খবর পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেছেন।

ধর্মপদ কিন্তু একটুও চিন্তিত হল না। বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি একটুও ভেব না বাবা. আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। বলে হিসাব ঠিক করে চূড়োটা বসিয়ে দিল। তারপর ভাবল, বাপের অসম্মান হল, অসম্মান হল তার বারো শো সঙ্গীর। তাই মন্দিরের চূড়োর উপর উঠে নিচের চন্দ্রভাগা নদীতে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই ধর্মপদকে নিয়ে ওড়িয়া সাহিত্যে অনেক কবিতা ও কাহিনী আছে। এ কাহিনী জানে না, এমন লোক কম আছে উড়িষ্যায়।

পথের ধারে কয়েকটা ঝাউ গাছ দেখে মনে হয়েছিল যে আমরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু সমুদ্রের জল দেখতে পাবার আগেই আমাদের বাস একখানা বড় বাসের পিছনে এসে দাঁড়াল। অন্য ধারে কয়েকটি দোকান, চা খাবারের দোকান, হোটেল। কোনারকের গাইড বইও এখানে বিক্রি হচ্ছে।

বাস থেকে নেমে আমরা একটা বড় গাছের নিচে দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম। একটি অনাদৃত রুক্ষ স্থান। তার মাঝখানে একটি ছোট মন্দির, মূল মন্দিরটি মনে হল ভেঙ্গে পড়েছে। যাত্রীদের অনেককে মন্দিরের উপরে দেখতে পেলাম।

পুপু চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখেছ দাদা!'

ঘণ্টু উল্লসিত হয়ে বলল, 'আমরাও উঠব।'

ধাপে ধাপে মন্দিরের উপর ওঠা যায়। উপরের দিকে তিন

সারি বারান্দা। তার উপরে যাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে চূড়োর উপরেও উঠেছে একজন। সেখান থেকে পড়ে গেলে কী হবে, সে কথা ভাবতেও ভয়ে গা শির শির করে।

ঘণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'চন্দ্রভাগা নদী কই ছোটকা?'

বললাম, 'সে নদী এখন দু মাইল দূর দিয়ে বইছে।'

আরও একটু কাছে এসে দেখতে পেলাম যে এ দেশে যাকে দেউল বলে সেই মূল মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়েছে। তার ভিত্তি আছে, দেবতা নেই। আমরা যা দেখছি, তার নাম জগমোহন। এই জগমোহনের ভিতর দিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। এখন জগমোহনের দ্বারও বন্ধ।

খানিকটা সমতল ভূমির পরে নাট মন্দির। তার দেওয়াল আছে, কিন্তু উপরে ছাদ নেই।

বিদেশীরা এই মন্দিরকে বলে ব্ল্যাক প্যাগোডা। বিদেশের নাবিকেরা এই নাম দিয়েছিল। তারা যখন জাহাজে করে এই দিকে আসত, তখন পুরীর সাদা মন্দিরকে বলত হোয়াইট প্যাগোডা, একে বলত ব্ল্যাক প্যাগোডা। জগমোহনের পাথরের রঙ ঠিক সাদা নয়। দূরের সমুদ্র থেকে হয়তো কালোই দেখায়।

পার্সি ব্রাউন সাহেব তাঁর কল্পনা দিয়ে এই মন্দিরের একটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছিলেন। তাতে প্রাঙ্গণের তিন দিকে তিনটি তোরণ। আমরা যে দিক থেকে এলাম, তার ঠিক উল্টো দিকে মন্দিরের প্রধান দ্বার। প্রথমে নাট মন্দির, সমতল ভূমিতে ছিল অরুণ স্তম্ভ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে জগমোহন ও দেউল। জগমোহনের চূড়া এখন ন্যাড়া, সে যুগে একটা ধ্বজা ছিল। বাঁ দিকে একটা অট্টালিকা ছিল। ছোট ছোট মন্দির গোটা তিন চার। সমস্ত প্রাঙ্গণ ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আর চার কোণায় চারটি ঘর।

আমরা এই প্রধান তোরণের নিচের বালির রাস্তা দিয়ে গিয়ে

একটা উঁচু জায়গায় উঠলাম। সেখান থেকে সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। সেই বিরাট পরিকল্পনার আজ সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

যাত্রীরা কেউ আমাদের সঙ্গে আসে নি। তারা মন্দিরের কারুকার্য দেখছে মনোযোগ দিয়ে। পুপু বলল, 'আমরা কেন মন্দিরের কাছে গেলাম না ছোটকা?'

বললাম, 'আগে আমরা দূর থেকে দেখে নিলাম, দূরে দাঁড়ালেই তো সমগ্র রূপটা চোখে পড়ে।'

তার পরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মন্দিরের গায়ে চাকা দেখতে পাচ্ছ, আর সামনের ঘোড়া?'

ঘন্টু উত্তর দিল, 'দেখতে পাচ্ছি ছোটকা।'

এইবারে আমি তাদের মন্দিরের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিলাম। এতো শুধু মন্দির নয়, এ একখানি বিরাট রথ। সূর্যদেব রথে চড়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। সাতটি বলবান অশ্ব একটি চব্বিশ চাকার রথকে টানছে। সপ্তাহের সাত দিন যেন সাতটি ঘোড়া। রথের বারো জোড়া চাকা, বারো মাসের চব্বিশ পক্ষ। প্রতিটি চাকায় যে আটটি করে অর বা স্পোক, তাকে দিনের অষ্ট প্রহর মনে করা যেতে পারে।

উল্লসিত হয়ে পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি ছোটকা, ঐ ঘোড়াগুলো রথ টানত?'

ঘন্টু ধমক দিয়ে বলল, 'দূর বোকা, পাথরের ঘোড়া কি রথ টানতে পারে!'

পুপু করুণ ভাবে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'পাথরের ঘোড়া মানুষের রথ টানতে পারে না, কিন্তু ওরা যে সূর্যদেবের ঘোড়া।'

উত্তর শুনে পুপু খুশী হল, বলল, 'চল ছোটকা, এবারে আমরা কাছে গিয়ে দেখি।'

আবার আমরা প্রধান তোরণের নিচে দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। বালির ভিতর পা ঢুকে যাচ্ছিল। কোন রকমে ঐ স্থানটুকু পেরতে হল।

প্রথমেই দুটো সিংহ দেখতে পেলাম। থাবা দিয়ে দুটো হাতিকে বসিয়ে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতির শুঁড়ে একটি করে মানুষ জড়ানো। মানুষ আর হাতিকে প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু সিংহের মূর্তি ঠিক সিংহের মতো নয়। একটি বিরাট পাথর খুদে এই তিনটি মূর্তি এক সঙ্গে তৈরি হয়েছে।

ছাদবিহীন নাটমন্দিরের দেওয়ালে সূর্যের আলো পড়েছে। ঝকমক করছে দেওয়ালের মূর্তিগুলি। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র হাতে নারী মূর্তি। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে তারা নাচছে।

এর পরে সমতল ভূমির উপর একটি অরুণ স্তম্ভ ছিল। চৌত্রিশ ফুট উঁচু, ষোলকোণা স্তম্ভ। তার মাথায় অরুণের মূর্তি। অনেক দিন আগে এক মারাঠা সাধু সেই স্তম্ভ নিয়ে গিয়ে পুরীর মন্দিরে স্থাপন করেছেন।

পুপু ঠিকই বলেছিল। রথের ঘোড়াগুলি জীবন্ত মনে হচ্ছে। তাদের প্রথম তিনটির মুখ সামনের দিকে, বাকি দু জোড়ার দু দিকে মুখ। এরা যেন বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। কালের যাত্রার প্রতীক।

রথের চাকা মন্দিরের গায়ে, তার অপরূপ কারুকার্য। শুধু ফুল লতাপাতা নয়, অনেক সাংকেতিক চিহ্নও আছে। অত্যন্ত অল্প স্থানে অলসকন্যার মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

তারপর মন্দিরের গায়ের চিত্র, সবই এই জীবনের আলেখ্য। কোথাও জিরাফ তার গলা বাড়িয়ে আঙুরের গাছ থেকে আঙুর খাচ্ছে। হাতি আর উট, সাপ লতার মতো জড়িয়ে আছে, আর রাজা চলেছেন পদাতিকের পুরোভাগে। কোথাও খাটের উপর স্বামী স্ত্রী বসে গল্প করছে, কোথাও ঋষি বসে আছেন

তপস্যায়। আবার কোথাও নানা বাদ্যযন্ত্র হাতে নাচের দল। বিরাট মূর্তি তাদের।

যাঁরা উপরে উঠেছিলেন, তাঁরা নেমে আসছিলেন। সিঁড়ি দেখতে পেয়ে ঘণ্টু লাফিয়ে উঠল, 'এস ছোটকা।'

পুপু এগিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'খুব সাবধান।'

অনেকটা উঠবার পরে আমরা একটা বারান্দার মতো দেখতে পেলাম। তার কোন রেলিঙ নেই। খুব সাবধানে আমরা চারি দিক ঘুরে দেখলাম। খানিকটা দূরে দূরে এক একটি নারীর মূর্তি। কেউ ঢোল বাজাচ্ছে, কেউ মন্দিরা, কেউ বাঁশির মতো যন্ত্রও বাজাচ্ছে।

ঘণ্টু আরও উপরে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বারণ করলাম। বললাম, 'আর সাহস নয়, এবারে আমরা নামব।'

কিন্তু নামবার আগে সূর্যের অপূর্ব মূর্তি দেখলাম। তিন দিকে তিনটি মূর্তি। দেওয়ালের গায়ে একটি বিরাট কুলুঙ্গির মতো জায়গা নানা কারুকার্যে অলঙ্কৃত। তার ভিতর চকচকে কালো পাথরের সূর্য মূর্তি। মাথায় মুকুট, গলায় মালা উপবীত। কানে কুণ্ডল, বাহুতে অলঙ্কার। কোমরে সামান্য আবরণের উপর মেখলা। পায়ের কাছে আরও অনেক মূর্তি। দুজনে বন্দনারত। আরও নিচে সাতটি তেজস্বী ঘোড়া।

পুপু বলে উঠল, 'সূর্যের হাত নেই যে ছোটকা?'

ঘণ্টু বলল, 'হাত ছিল, ভেঙে গেছে।'

কিন্তু কেমন করে ভেঙ্গেছে তা আমরা জানি না। হয়তো কালা-পাহাড়ের আক্রমণের সময় ভেঙ্গেছে।

মন্দিরের উপর থেকে নেমে এসে আমরা প্রথমে খেয়ে নিলাম। তারপর বিশ্রাম করলাম খানিকক্ষণ। সেই সময় আমাকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল—কে গড়েছে এই মন্দির, আর কেন ভেঙ্গে পড়ল—তার উত্তর।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সে পুরাণের কথা। তার কোন প্রমাণ নেই। ইতিহাসে আমরা তিনটি মন্দিরের উল্লেখ পাই। একদা এই অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচী নদীতে তখন সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করত। নদীর দুই তীরে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও অসংখ্য মন্দির ছিল। নদীর মোহনায় যে বন্দর ছিল, চীনা পরিব্রাজক হিউ এন চাঙ তার নাম বলেছেন চেলি-তালো। চন্দ্রভাগা নদীও খুব বড় ছিল। এই সমৃদ্ধ অঞ্চলে নবম শতাব্দীতে কেশরী বংশের এক রাজা প্রথম সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন।

তারপর দেখা যায় রাজা নরসিংহদেবের নাম। বারো বছরের রাজস্ব ব্যয় করে তিনি একটি সূর্যের মন্দির নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়। তখন আরও আটাশটি মন্দির এখানে ছিল।

আমরা এখন যে মন্দির দেখছি, সেটি নাকি তৃতীয় মন্দির। এটি নির্মাণ করেছেন লাঙ্গুড়া নরসিংহদেব। তখন চন্দ্রভাগা নদী এই মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। সমুদ্রগামী জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলত কোণার্ক বন্দরে। অর্ক মানে সূর্য। সূর্যের কোণা বা দেশের যে কোণ সূর্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই নাম কোণার্ক। দেউলের ভিতর সূর্যের মূর্তিটি এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে প্রভাতে প্রথম সূর্যের আলো তাঁর মুখে পড়ত।

এই মন্দিরের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা লাঙ্গুড়া নরসিংহদেব তাঁর মন্ত্রী শিবেই সান্তরাকে মন্দির নির্মাণের ভার দিলেন। পদ্মতোলা গণ্ডে মন্দির উঠবে. তার জন্য দিনের পর দিন পাথর ফেলা হতে লাগল। কিন্তু সেই পাথর আর জলের তলায় খুঁজে পাওয়া গেল না। মন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

এমন সময় দেবী রামচণ্ডী এলেন ঘুঁটে কুড়োনির বেশে। মন্ত্রীকে নিজের কুটীরে নিয়ে গেলেন নিমন্ত্রণ করে, আর খেতে দিলেন গরম জাউ। মন্ত্রী তাতে হাত দিতেই তাঁর হাত পুড়ে গেল।



সূর্যদেবের মূর্তি, কোণারক

দেবী বললেন, একটু ধৈর্য ধর। তারপর তাঁকে মন্দির তৈরির পদ্ধতি শেখালেন। ফিরে এসে মন্ত্রী সূর্যের মন্দির তৈরি করলেন আর তার কাছে রামচণ্ডীরও মন্দির। এ অঞ্চলের লোক বলে, মায়া দেবীর মন্দির।

তারপর মন্দির ভেঙ্গে পড়বার কথা।

কেউ বলেন কালাপাহাড় ভেঙ্গেছে, কেউ বলেন ঝড়ে বা ভূমিকম্পে ভেঙ্গেছে। কেউ আবার মনে করেন যে মন্দিরের ভিতের নিচে বালি ছিল, তাই নিজে থেকেই ভেঙ্গে পড়েছে। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু অন্য কথা বলে। বিষ্ণু মহারাণার ছেলে ধর্মপদ আত্মহত্যা করে মরে নি। তাকে মন্দিরের উপর থেকে ফেলে দিয়েছিল বিষ্ণু মহারাণার সঙ্গীরা। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তাদের অক্ষমতার কথা সবাই জেনে ফেলবে। এই জন্যেই তাকে তারা হত্যা করেছিল। এ তো কম বড় পাপ নয়! এই পাপেই মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে।

একটি ঐতিহাসিক গল্প আছে। অনেকে সেই গল্পটিকেই সত্য বলে মনে করেন। এই মন্দিরের উপরে নাকি একটা চুম্বক লোহা ছিল। সেই চুম্বক সমুদ্রের জাহাজকে পারের কাছে টেনে আনত। নাবিকদের ভারি অসুবিধা হত তাতে। তাই তারা একদিন রাতে চুপি চুপি এসে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙ্গে সেই চুম্বকটা বার করে নিয়ে গেল। সকাল বেলায় মন্দিরের পুরোহিত এই ব্যাপার দেখে অমঙ্গলের ভয়ে অস্থির হলেন। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পুরীতে প্রতিষ্ঠা করলেন। কেউ বলেন, মন্দিরের পুরোহিত নয়, রাজা নরসিংহদেব ঠাকুর সরিয়ে ছিলেন।

তারপর যা হবার তাই হল। যে মন্দিরে ঠাকুর নেই, সে মন্দির ভূমিকম্পে ভাঙ্গল, না ঝড়ে ও বজ্রপাতে, সে খবর আর কেউ রাখল না।

বিশ্রামের পরে আমরা জাদুঘর দেখলাম। একটা ছোট বাড়িতে অনেক মূর্তি সাজিয়ে রাখা আছে। এ সমস্ত মূর্তিই এক সময় চারি দিকে ছড়ানো ছিল।

তারপরে দেখলাম নবগ্রহের মন্দির। এক খানা ভারি পাথরের উপর নবগ্রহের মূর্তি। বামে সূর্য, দক্ষিণে রাহু, মাঝখানে অন্য সাতটি গ্রহ। এই পাথরখানি নাকি জগমোহনের সিংহদ্বারে ছিল, ইংরেজ সরকার তা লণ্ডন মিউজিয়ামে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পাথরখানা কেটে দু খণ্ড করেও নড়াতে পারেন নি! শেষ পর্যন্ত এখানকার জাদুঘরেই রেখেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলল, এ দৈব ঘটনা, গ্রহরা এই স্থান ছেড়ে যাবেন না বলেই অমন ভারি হয়েছিলেন। তারা চেষ্টা করে নূতন মন্দিরে নবগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়েছে।

শৌখিন যাত্রীদের জন্য কোনারকে এরোড্রোম তৈরি হয়েছে। উড়োজাহাজে চড়ে তাঁরা উড়ে আসবেন। তাঁদের বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থাও আছে। একটি ইন্‌স্পেকসন বাংলোয় গোটা দুই ঘর আছে। যাঁরা ছবি তুলতে ভালবাসেন, তাঁরা এখানে রাত্রিবাস করে সকাল বেলায় ছবি তোলেন। দুপুরের প্রখর রোদ ছবি তোলার উপযোগী নয়।

পুপু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই ফিরে যাচ্ছে ছোটকা।'

ঘণ্টু ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমাদের ফেলে যাবে না তো!'

আমি হেসে বললাম, 'আমরাও ফিরব।'

শুধু কোনারক থেকে নয়, পুরী থেকেই আমরা ফিরব। আমাদের অনেক দূরের পথ। রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে, সেই প্রান্তে আমাদের পৌঁছতে হবে, ফিরতে হবে সেখান থেকেও। পুরী পৌঁছেই আমরা পুরী ছাড়ার কথা ভাবব।



চিল্কা

খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে দুপুর বারোটার পরে পুরী থেকে একখানা ট্রেন ছাড়ে। সেই ট্রেনে মাদ্রাজ যাওয়া যায়। ওয়াল-টেয়ারে পৌঁছয় ভোর বেলা। তাড়াতাড়ি ওয়ালটেয়ার দেখে সকাল বেলাতেই মাদ্রাজ মেল ধরা যায়। পর দিন সকালে মাদ্রাজ। আমাদের হোটেলের ম্যানেজার এই পরামর্শই দিলেন। বললেন, 'গোপালপুর অন সী দেখতে পাবেন না, বারহামপুর স্টেশনে নেমে আট মাইল পথ বাসে যেতে হয়। একেবারে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহর। যাঁরা নির্জনতা ভালবাসেন, তাঁরাই সেখানে বেড়াতে যান।'

তারপরে বললেন, 'ট্রেন থেকেই চিল্কা লেক দেখতে পাবেন। কেউ রম্ভা স্টেশনে নামে, কেউ নামে বালুগাঁয়। আপনারা একটু নজর রাখবেন, সন্ধ্যার আগেই চিল্কা দেখতে পাবেন।'

ম্যানেজারের পরামর্শ মতো আমরা পর দিন দুপুরের ট্রেনেই পুরী ত্যাগ করলাম। সাক্ষী গোপালের উপর দিয়ে ট্রেন খুর্দা রোডে এল। তারপর পূর্বে কলকাতার দিকে না গিয়ে পশ্চিমে মাদ্রাজের দিকে চলল।

ট্রেনের দোলায় যেন ঘুমের নেশা আছে। ঘণ্টু ও পুপু খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছে, আমিও বসে বসে খানিকক্ষণ ঝিমিয়েছি। খুর্দা রোড ছাড়তেই পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'এইবারে চিল্কা আসবে, তাই না ছোটকা ?'

বললাম, 'এখনও তার অনেক দেরি।'

ঘণ্টু বলল, 'এখনও তো বিকেল হয় নি, সন্ধ্যের সময় আমরা চিল্কা দেখব।'

নিশ্চিন্ত মনে ওরা আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল।

চিল্কার কথা আমরা ভূগোলে পড়েছি। সমুদ্র নয়, আবার হ্রদও নয়। সমুদ্রের মতো বিরাট জলরাশি সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদে পরিণত হয়েছে, একটা মুখ শুধু যুক্ত আছে সমুদ্রের সঙ্গে। এই জাতের জলাশয়ের ভৌগোলিক নাম লেগুন। কিন্তু চিল্কাকে আমরা হ্রদ বলি, চিল্কা লেক। চিল্কার মাছ কলকাতায় বিক্রি হয়।

সন্ধ্যার আগেই আমরা রম্ভা স্টেশনে পৌঁছলাম। সূর্যাস্ত হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে নামে নি। দু একজন যাত্রী ওঠা নামা করল, আর সবাই স্থির হয়ে বসে রইল।

আমরা স্থির থাকতে পারলাম না। প্রবল কৌতূহল নিয়ে রেল লাইনের দক্ষিণ দিকে চেয়ে রইলাম। তারপরেই দেখতে পেলাম চিল্কা। সমুদ্রের মতো দিগন্ত বিস্তৃত, কিন্তু নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো। এক দিকে পূর্ব ঘাট পাহাড় নীল বনময়, অন্য দিকে সমুদ্র, কিন্তু ঠিক সমুদ্রের মতো নয়। মাথাকাটা ছোট ছোট পাহাড় আর বালির দ্বীপ দিয়ে অকূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন।

পুপু বলল, 'কী সুন্দর দেখেছ ছোটকা ?'

ঘণ্টু বলল, 'নৌকায় বসে ওরা কী করছে?'

বললাম, 'মাছ ধরছে।'

পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'মাছ কী করবে?'

বললাম, 'ওরা হয়তো পিকনিক করতে এসেছে। রাতে ঐ মাছ ভাজা দিয়ে খিঁচুড়ি খাবে।'

ঘণ্টু ও পুপু একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা পিকনিক করব না?'

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আমি বললাম, 'তাহলে নেমে পড়ি এস।'

ঘণ্টু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

চিল্কার জল আর শেষ হচ্ছে না। বেশি চওড়া নয়, হয় তো মাইল দশেক হবে। কিন্তু লম্বায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল হবে বলে শুনেছি।

অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এল। কিন্তু কালির মতো অন্ধকার নয়। স্বচ্ছ অন্ধকার। জ্যোৎস্নার রাতে যেমন পৃথিবীটাকে দেখি, কতকটা তেমনি।

পুপু বলল, 'কী মনে হচ্ছে জান ছোটকা?'

'কী?'

'ওপরের আকাশটা আমাদের ছুঁতে আসছে।'

বাধা দিয়ে ঘণ্টু বলল, 'না না, চিল্কার জল ওপরের আকাশটাকেও ছেয়ে ফেলেছে।'

আমার মনে হল, ওরা কেউই ভুল বলছে না। আকাশে আর জলে এখন কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ নেই মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, ভাষায় ও ধর্মে। আমরাই জোর করে গণ্ডি টেনে প্রভেদ গড়ি। ঘরের বাহিরে গেলে সে গণ্ডি দূরে সরে যায়, শেষ হয় সংকীর্ণতার।

আমাদের যাত্রা এখন শেষ হবে না।

সমাপ্ত